একাত্তরের একদল দুষ্টু ছেলে

আনিসুল হক

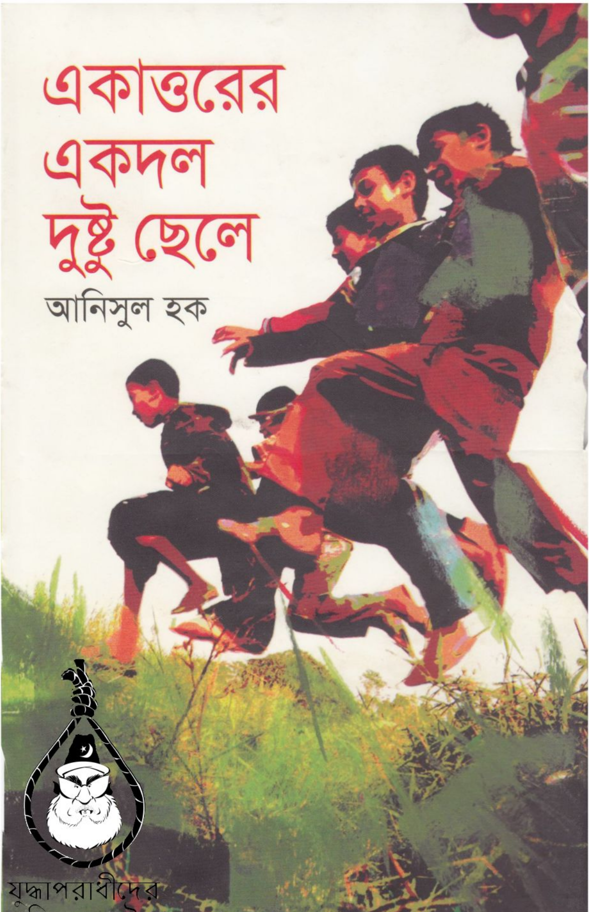

যুদ্ধাপরাধীদের

ওরা সত্যি ভীষণ দুষ্টু। ক্লাস সিক্সের ছাত্র ওরা। একটা ক্লাব করেছে। সূর্যসেনা সংঘ। যদিও পল্টুমামা প্রস্তাব করেছিলেন, ক্লাবের নাম রাখা হোক দুষ্টু ছেলের দল। দুষ্টুমিতে ওই কিশোরদের সত্যি কোনো জুড়ি ছিল না। এমনকি জ্যান্ত সাপ ধরে এনে ভয়ঙ্কর শিক্ষক কাদির স্যারের জর্দার কৌটায় ভরে রাখার ঘটনাও এরা ঘটিয়েছিল। এই দুষ্টু ছেলের দল ১৯৭১ সালে অংশ নিল এক ভয়াবহ অভিযানে। পল্টুমামা ধরা পড়েছিলেন পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে, তাকে টর্চার সেলে বেঁধে রেখে ভয়াবহ অত্যাচার করতে লাগল মিলিটারিরা। দুষ্টু ছেলের দল ঠিক করল, তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প আক্রমণ করবে, তবে শুধু অস্ত্র হাতে নয়, বুদ্ধি দিয়ে।

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র ▪ কামরুল হাসান মিথুন

যুদ্ধাপরাধীদের

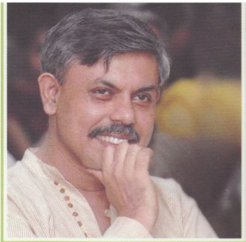

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো: মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা—নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়। সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, সিটি ব্যাংক আনন্দআলো পুরস্কার, খালেকদাদ চৌধুরী পদক, খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। . . . এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।'

যুদ্ধাপরাধীদের

যুদ্ধাপরাধীদের

একাত্তরের একদল দুষ্টু ছেলে

আনিসুল হক

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

যুদ্ধাপরাধীদের

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩
স্বত্ব
তৌহিদুর রহমান
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা
দাম
একশত পঁচিশ টাকা

ISBN 978 984 90382 4 5

Eakatture Eakdal Dushtu Chhele by Anisul Haque
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
4th Edition : February 2013, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 125.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Hights, N.Y. 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

অনলাইনে পাওয়া যাবে ❑ **রকমারি**.com
www.rokomari.com

উ|ৎ|স|র্গ

শ্রেয়, ওহি, শিহা, স্নেহা

দুটো কথা

একাত্তরে একদল দুষ্টু ছেলে প্রথম বেরিয়েছিল 'প্রথম আলো কিশোর নববর্ষ সংখ্যা ১৪১৯'-এ। বই হিসেবে বের করার সময় এটায় খানিকটা পরিবর্ধন পরিবর্তন করা হলো।

বইটি তোমাদের কেমন লাগল, আমাকে জানাতে পারো ই-মেইল করে।

আনিসুল হক

anisulhoque1971@gmail.com

যুদ্ধাপরাধীদের

পল্টুমামার কাছে এসে শোভন বলল, 'মামা, আমরা একটা ক্লাব করছি। ক্লাবটার একটা নাম দাও।'

পল্টুমামা আকাশের দিকে তাকালেন। দার্শনিকের মতো ভাব করে বললেন, 'ক্লাবের নাম রাখ "দুষ্টু ছেলের দল"।'

শোভন গম্ভীর মুখে বলল, 'মামা, কেন ইয়ার্কি করছ। তোমাদের বড়দের নিয়ে এইটাই হলো মুশকিল। তোমরা ছোটদের কোনো জিনিসকে ঠিক পাত্তা দাও না।'

পল্টুমামা বললেন, 'তোদেরকে আমি চিনি না? চিনি এবং জানি। জেনেশুনেই বলছি। তোদের দলটা হলো এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু। দুষ্টু এবং বিপজ্জনক। দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস গ্যাং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

এই দুষ্টু ছেলের দলের সবাই সোনাতলা হাইস্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে।

শীতকাল। সোনাতলা বন্দরে বেশ শীত পড়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস। বাইগুনি বিলে বসেছে শীতের পাখির মেলা। সাদা সাদা শাপলা ফুলের

পাশে শাপলার সবুজ গোলপাতা ভাসছে; আছে নানা গুল্মদাম; কিন্তু সেসবও ছেয়ে গেছে বিচিত্র ধরনের অতিথি পাখির পাখার নিচে।

বিকেলবেলা সোনাতলা হাইস্কুলের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন পল্টুমামা। টানা টিনশেডের ঘর। সাদা রঙের ইটের দেয়াল। বারান্দা বেশ উঁচু। লাল রঙের পাকা মেঝে। রোদ এসে পড়েছে এই জায়গাটায়। অপরাহ্ণের নরম রোদে তাঁর খুব আরাম লাগছে। দূরে বাইগুনি বিলে পাখির মেলা তিনি দেখছেন কি দেখছেন না!

শোভনের হাফপ্যান্ট পরা ছায়াটাকেও লম্বা দেখা যাচ্ছে। ওর গায়ে একটা কমলা রঙের সোয়েটার। পল্টুর বুবু অর্থাৎ শোভনের মা এটা নিজ হাতে বুনে দিয়েছেন।

শোভনকে খুব হতাশ দেখাচ্ছে। ক্লাবের নামের ব্যাপারটা নিয়ে সে বোধ হয় খুবই চিন্তিত।

পল্টুমামা বললেন, 'শোন। তুই আমার পাশে বস। আমি এক থেকে এক শ পর্যন্ত গুনব। এই সময়টায় তুই যদি একটুও নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিস, তাহলে তোদের ক্লাবের একটা সুন্দর নাম আমি অবশ্যই দেব।'

AMARBOI.COM

শোভন উঁচু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। পল্টু মামার পা বারান্দা থেকে ঝুলে প্রায় নিচের লম্বা ঘাস ও চোরকাটা ছুঁয়ে ফেলেছে, কিন্তু শোভনের পা সত্যি সত্যি ঝুলে আছে।

পল্টুমামা বললেন, 'বদনা, হাত দুটো একখানে করে কোলে রাখ। একদম নড়বি না।'

শোভন হাত দুটো জোড় করে কোলে রাখল। পল্টুমামা মাত্র এক থেকে এক শ পর্যন্ত গুনবেন, এর মধ্যে নড়াচড়া না করলেই চলবে। খুব সহজ কাজ। না পারার কোনোই কারণ নেই।

পল্টুমামা স্থানীয় কলেজে আইএ পড়ছেন। ফার্স্ট ইয়ারে। পড়ুয়া ধরনের ছেলে। চোখে একটা কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। গায়ে হাওয়াই শার্ট। পরনে লুঙ্গি। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

পল্টুমামা এক থেকে গুনতে শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে গুনছেন। শোভনও একদম নট নড়নচড়নটি হয়ে বসে আছে। এটা তার জন্য কঠিন

পরীক্ষা। সবাই জানে, শোভন একদণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। তার হাতে-পায়ে স্প্রিং লাগানো। তালাপাতার সেপাইয়ের মতো তার হাত-পা খালি নড়ে।

পল্টুমামা আশি পর্যন্ত গুনে ফেলেছেন। শোভন বোধ হয় এই পরীক্ষায় পাসই করে ফেলল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মশা এসে বসল শোভনের পায়ে। সর্বনাশ! আর তো কোনো উপায় নেই। পা তাকে নড়াতেই হবে। পল্টুমামা নব্বই পর্যন্ত গুনেছেন। তাঁর চোখ পড়ল শোভনের পায়ে। তিনি মশাটা উড়িয়ে দিলেন হাত নেড়ে। বিরানব্বই। তিরানব্বই। মশা গিয়ে পড়ল পল্টুমামার গালে। শোভন আড়চোখে দেখছে। সে স্থির থাকতে পারল না। কষে একটা চড় বসিয়ে দিল পল্টুমামার গালে। পল্টুমামার চোখ থেকে চশমা ছিটকে পড়ল।

তখনই খিলখিল হাসির আওয়াজ। লিপটন, মাজেদ আর অরুণ এই দৃশ্য আড়াল থেকে দেখছিল। তারা হেসে কুটি কুটি।

পল্টুমামা বললেন, 'চশমা ভেঙে গেল নাকি। দে বদনা, চশমাটা দে। এই কে হাসে? হাসে কে?'

'কেউ হাসে না।' বলে লিপটন, মাজেদ আর অরুণ আরও জোরে হেসে উঠল।

শোভন বলল, 'মামা, তোমার চশমা পাবে, তার আগে আমাদের ক্লাবের একটা সুন্দর নাম দাও।'

মামা বললেন, 'চশমাটা দে। চশমা না দিলে নাম দেব কেমন করে রে বদনা।'

'চশমার সাথে নামের কী সম্পর্ক?' শোভন বলল, 'তুমি তো নাম বলবে মুখ দিয়ে। চোখ দিয়ে না।'

'আগে দে, গাধা। তোর মুখ না দেখলে নাম আসবে কোত্থেকে?'

শোভন চশমাটা পল্টু মামার হাতে দিল। পল্টুমামা চশমা চোখে দিলেন।

ততক্ষণে অন্য তিন বালক তাদের কাছে চলে এসেছে। তাদের হাসির রেশ এখনো চোখ-মুখ থেকে মিলিয়ে যায়নি।

AMARBOI.COM

পল্টু বললেন, 'লিপ্টন, মাজেদ আর অরুণ। আরও তিন বিচ্ছুর আগমন ঘটেছে দেখছি। এই, তোরা হাসলি কেন?'

অরুণ বলল, 'না না, আমরা হাসিনি। এই শোভন, তুই পল্টুমামার গালে...' বলেই অরুণ খিক করে হেসে ফেলল।

শোভন দাঁতে জিভ কেটে বলল, 'এই অরুণ। আমি আবার কখন পল্টুমামার গালে চড় মারলাম। মামার গালে একটা মশা বসেছিল, সেটা না মারলাম।'

মশা বসেছিল নাকি? মাজেদ হাসি চেপে বলল।

শোভন দেখল এ তো বিপদ। এত কষ্ট করে পল্টুমামাকে একটা নাম দিতে রাজি করানো গেল, আর এই ইচড়ে পাকাগুলো কিনা সেই উদ্যোগটাই ভেস্তে দিচ্ছে।

শোভন তাড়াতাড়ি হাতের মধ্যে একটা মরা ঘাস তুলে নিয়ে বলল, 'এই দেখ, মশার লাশ'-বলেই সে ফুঁ দিয়ে ঘাসটা ফেলে দিল।

পল্টুমামা বললেন, 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার আসিলে তব বধিব পরাণ। যারা অন্যদের রক্ত খায়, এই তাদের পরিণতি হওয়া উচিত। সাব্বাস, বদনা!'

শোভন আশ্বস্ত হলো। বলল, 'মামা, নামটা দিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি রে বদনা'-পল্টুমামা চড় খাওয়া গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন।

লিপ্টনের বাম হাতে ব্যান্ডেজ। দুদিন আগে স্কুলের সীমানার তারকাঁটার বেড়ার ফাঁক গলে বেরোতে গিয়ে তার ডান হাতের কনুইয়ের নিচে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। সে বলল, 'পল্টুমামা, শোভনকে আপনি বদনা বলে ডাকলেন কেন। সেটা কিন্তু বোঝা গেল না, মামা।'

পল্টুমামা একগাল হেসে বললেন, 'ও রে, সেটাও জানতে চাস! ওকে আমি ডাকি বদ বলে। আর ও বলে, মামা, আমি বদ না। সে নিজেই নিজেকে বদনা বলে দাবি করলে আমার কী করার আছে তোরা বল।'

ওরা তিনজন হাসতে লাগল। লিপটন ফের পুরোনো প্রসঙ্গ পাড়ল, 'তা পল্টুমামা, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু শোভন আপনার গালে চড় মারল কেন, মামা?'

AMARBOI.COM

পল্টুমামা বললেন, 'আর কেন। একটা মশা আমার গালে বসেছিল। আমার রক্ত খাচ্ছিল। আমার ভাগ্নে হয়ে শোভন সেটা কী করে সহ্য করে বল! তাই আর কি!'

মাজেদ বলল, 'তাই বলেন। আমরা ভাবলাম, কী না কী! মামা, আপনার গালে তো আরেকটা মশা।'

পল্টুমামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বেশি ফাজলামো করবি না। খবরদার!'

তিনি নিজেই নিজের গালে আলতো করে একটা চড় বসালেন।

সবাই আবার হো হো করে হেসে উঠল।

'আসলে কোনো মশা ছিল না, পল্টুমামা।' অরুণ বলল।

'ছিল ছিল। এই, বেশি বকিস না তো অরুণ।' শোভন চোখ টিপল।

'মামা, আমাদের ক্লাবের নাম?' শোভন মামার হাত ধরে ঝুলে পড়ল।

পল্টুমামা বললেন, 'যা তোদের ক্লাবের একটা ভালো নাম দিই। তোদের ক্লাবের নাম হোক "অরুণ সংঘ"।'

অরুণ বলল, 'আমার বাবা যদি জানে আমি ক্লাব করেছি, পিটিয়ে ময়দা বানিয়ে দেবে।'

শোভন বলল, 'মামা, আমাদের ক্লাবের নাম কারও নামে রাখার দরকার নাই। একটা নিউট্রাল নাম দাও।'

পল্টুমামা বললেন, 'অরুণ তো নিউট্রাল নামই। অরুণ মানে তো সূর্য।'

লিপ্টন বলল, 'তাহলে "সূর্য সংঘ" রাখি।'

পল্টু মামা বললেন, 'খারাপ বলিসনি। তবে সূর্যের সঙ্গে সংঘটা ঠিক মানাচ্ছে না। দাঁড়া। একটু ভাবি। তোরাও ভাব।' পল্টুমামা ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নিজের চিবুকে টোকা দিতে লাগলেন। বাকি আঙুলগুলো মুঠো করে ধরা।

তিনি বললেন, 'এই, তোরাও ভাব।'

অরুণ বলল, 'ভাবছি তো।'

পল্টুমামা বললেন, 'আমার মতো করে ভাব। গালে হাত দিয়ে ভাব। না হলে ইনডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে মাথায় আস্তে আস্তে বাড়ি দে। মাথার ভেতর থেকে আইডিয়া বের করতে হলে একটু ঝাঁকি তো দিতে হবে। নাকি?'

AMARBOI.COM

চারজন বালক গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল বারান্দায়।

পল্টুমামা বললেন, 'পেয়েছি। তোদের ক্লাবের নাম হলো "সূর্যসেনা সংঘ"।'

অরুণ বলল, 'অরুণ সংঘই তো ভালো ছিল।'

মাজেদ বলল, 'না না, এটা অনেক ভালো।'

শোভন বলল, 'সূর্যসেনা সংঘই তো ভালো।'

লিপটন বলল, 'হ্যাঁ। নামটার একটা মানে আছে। সূর্যসেন ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের শহীদ। মাস্টারদা। আমরা ঠিক সূর্যসেন না রেখে সূর্যসেনা রেখে দিলাম। আমার পছন্দ হয়েছে।'

বাহবা, লিপটন এত সুন্দর করে ভাবতে পারে! পল্টুমামা বললেন, 'লিপটনের ব্যাখ্যা শুনে আমার বুকটা গর্বে ভরে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম, দুষ্টুমি ছাড়া তোরা আর কিছুই পারিস না। এখন তো দেখি তোদের মধ্যেও একটু-আধটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।'

কাজেই সূর্যসেনা সংঘ নামটাই গৃহীত হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

শোভনদের সূর্যসেনা সংঘ ক্লাবটার নাম যে দুষ্টু ছেলের দল হতে পারত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

একটার চেয়ে আরেকটা পাজি।

মাজেদের অত্যাচারে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা সব সময় অস্থির। সে যদি কোনো বাড়িতে বেড়াতে যায়, সেই বাড়ির লোকদের প্রথম কাজ হয়, হাতের কাছে যেসব জিনিস আছে, সবকিছু তাকের ওপর তুলে রাখা, মাজেদের নাগালের বাইরে রাখা। মাজেদ যেমন সেদিন তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছে। প্রথমেই সে টিউবওয়েলের পাড়ে গিয়ে মুখের মধ্যে পানি নিল। তারপর চিনির বয়াম খুলে তার মধ্যে কুলি করে দিল।

মামি হায় হায় করতে লাগলেন। মাজেদ বলল, 'শরবত খাব, মামি। শরবত বানান।'

অরুণের দুষ্টুমির সামান্য বর্ণনা:

ইতিহাস স্যার আবদুল কাদির ভয়ঙ্কর মানুষ। তিনি গরু-পেটানো বেত দিয়ে ছাত্রদের পিটিয়ে থাকেন।

একদিনের কথা।

অরুণদের বন্ধু শামসুকে কাদির স্যার ভয়ঙ্কর রকম পেটালেন। শামসুর অপরাধ, সে স্যারের কথা শোনেনি। স্যার নাকি শামসুকে পেছন থেকে ডেকেছিলেন। শামসু শুনেও না শোনার ভাণ করেছে।

শামসু ক্লাসে বসে ছিল। কাদির স্যার তার গরুমারা বেত হাতে ক্লাসরুমে প্রবেশ করলেন এবং শামসুকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করলেন।

শামসু মাথা বাঁচাতে হাত দিয়ে মাথা আড়াল করল। স্যার হাতেই পেটাতে লাগলেন। ছেলেরা কিছু বোঝার আগেই শামসুর হাত ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল।

কাদির স্যার গজর গজর করতে শুরু করলেন, 'আমি এত করে তোর নাম ধরে ডাকি, তুই শুনেও না শোনার ভাণ করিস।'

তখন অরুণ দাঁড়িয়ে পড়ল, 'স্যার, আপনি জানেন না শামসু কানে কম শোনে?'

'কানে কম শোনে? তোমার উকিল ধরেছে! কানে কম শুনলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে কেন?' কাদির স্যার বেত উঁচিয়ে তেড়ে এলেন অরুণের দিকে। ঠাস ঠাস করে অরুণের পিঠে বসিয়ে দিলেন দুই ঘা।

অরুণ সেই বিকেলেই ঘোষণা করল, কাদির স্যারকে আমি শাস্তি দেবই। ভয়ঙ্কর শাস্তি।

কাদির স্যার পান খান। তাঁর সঙ্গে থাকে একটা পলিথিনের ব্যাগ। তাতে থাকে পান, সুপারি, চুন আর একটা হলুদ কাগজে মোড়া কৌটায় থাকে জর্দা।

স্কুল ছুটি হয়েছে। ক্লাসের সবার মন খারাপ। শামসু যে কানে কম শোনে এটা সবার জানা। আর কাদির স্যার জানেন না? এইভাবে পেটালেন তিনি শামসুকে! আবার বলেন কিনা, কানে কম শুনলে স্কুলে ভর্তি হয়েছে কেন? প্রতিবন্ধীদেরও যে স্কুলে পড়ার অধিকার আছে, এইটাও তিনি বোঝেন না। এই ধরনের লোককে যেভাবেই হোক, শায়েস্তা করা দরকার।

AMARBOI.COM

অরুণ আর মাজেদ শামসুকে নিয়ে ক্লাসের বাইরে গেল। শামসুর হাত থেকে এখনো রক্ত পড়ছে। জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে আছে। গাঁদা ফুলের পাতা পিষে এই কাটা জায়গায় লাগাতে হবে।

মাজেদ শামসুকে ধরে রইল স্কুলমাঠের পাশে, আমগাছের নিচে। অরুণ গেল বাগানে, গাঁদা ফুলের পাতা তুলতে।

সেখানেই অরুণ দেখল, একটা ছোট্ট সাপ, ঘাসের মধ্যে মাথা তুলে অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

সে মুহূর্তেই অরুণ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। সামনে একটা জর্দার কৌটা পড়ে আছে অনাদরে। সাপটার লেজে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সে আরেক হাতে তুলে নিল কৌটাটা।

মাজেদ তাড়াতাড়ি আয়।

মাজেদ দৌড়ে এল। অরুণের হাতে সাপের মতো একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটার উত্তেজনা সামলানো মুশকিল।

অরুণ বলল, তাড়াতাড়ি কৌটাটা খোল। সাপটা কৌটায় ভরি।

সে-আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হলো না মাজেদের । সে কৌটাটা তুলে এনে কৌটার খাপ খুলল। অরুণ সাপের মাথা কৌটায় ধরে লেজটা ছেড়ে দিতেই সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট্ট কৌটায় নিজের জায়গা করে নিল। মাজেদ সঙ্গে সঙ্গে কৌটার খাপ লাগিয়ে ফেলল।

AMARBOI.COM

অরুণ বলল, 'কাদির স্যারকে এইটা দিয়েই টাইট দিয়ে দেব।'

মাজেদ বলল, 'কী বলিস?'

'হ্যাঁ, একটা কানে কম শোনা ছেলের সাথে কী ব্যবহার করতে হয় যে জানে না তার জন্য সর্পচিকিৎসাই একমাত্র চিকিৎসা।'

রাতে উত্তেজনায় মাজেদের আর ঘুম হয় না। কখন সকাল হবে। কখন সে স্কুলে যাবে। অরুণ সাপটা নিয়ে আসবে। তারপর কী যে হবে!

মাজেদ সেদিন স্কুলে এল সবার আগে। তখন কেবল দপ্তরি রহমত চাচা স্কুলঘরের দরজার তালাগুলো খুলছেন। ঝাড়ুদার রসিকলাল ভাই বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছেন।

অরুণ এল যথাসময়ে। তার প্যান্টের পকেট উঁচু। বোঝাই যাচ্ছে কৌটাটা সে প্যান্টের পকেটে এনেছে।

কাদির স্যার ক্লাসে এলেন থার্ড পিরিয়ডে।

মাজেদ আর অরুণ পাশাপাশি বসেছে।

মাজেদ বলল, 'কী করবি রে অরুণ।'

অরুণ ফিসফিসিয়ে জবাব দিল, 'স্যার টেবিলের ওপর পানের ব্যাগটা রাখুক। কৌটা বদল করে দেব।'

মাজেদ বলল, 'কেমন করে?'

অরুণ বলল, 'বুদ্ধি বের কর। বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে।'

মাজেদ বলল, 'আমার মাথায় বুদ্ধি নাই। তুই বুদ্ধিটুদ্ধি কী বের করতে চাস, কর।'

অরুণ বলল, 'তুই এক কাজ কর। ক্লাসের পেছনে গিয়ে জানালা দিয়ে থুতু ফেলতে থাক। তোকে মারার জন্য স্যার নিশ্চয়ই পেছনে যাবে। সেই সুযোগে...'

মাজেদটা বোকা আছে। সে সত্যি চলে গেল ক্লাসরুমের পেছনে।

খ্যাক খ্যাক করে থুতু ফেলতে লাগল জানালা দিয়ে।

কাদির স্যার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তোর কী হয়েছে?'

মাজেদ বলল, 'স্যার, জানালা দিয়ে দেখেন এটা কী? এত থুতু দিচ্ছি যাচ্ছে না।'

AMARBOI.COM

স্যার বললেন, 'হারামজাদা, তোর কি এখন জানালায় যাওয়ার কথা, নাকি ইতিহাস পড়ার কথা। বল, সুলতানা রাজিয়ার বাবার নাম কী?'

কাদির স্যার তাঁর বেতটা নিয়ে মাজেদের দিকে তেড়ে গেলেন। সবাই সেদিকে তাকিয়ে। টেবিলের ওপর তার পানের থলে। অরুণ ছুটছে। সে তাড়াতাড়ি পলিথিন ব্যাগটা খুলে ভেতরের জর্দার কৌটাটা নিয়ে পকেট থেকে সাপভরা কৌটা বের করে ব্যাগের ভেতরে রেখে দিল। কেউ টেরই পেল না। পাবে কী করে? সবাই তো পেছনের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

কাদির স্যার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন, 'কী দেখলি?'

মাজেদ বলল, 'স্যার, একটা সাপ, এই পর্যন্ত উঠে এসেছিল। আমি এত থুতু দিই, তাও যায় না।'

কাদির স্যার বললেন, 'কী বলিস। সাপ। আমি আবার সাপ জিনিসটা একদমই সহ্য করতে পারি না। বাঘ দেখলেও আমি অত ভয় পাব না, যত ভয় আমি পাই সাপকে।' তারপর মাজেদের পিঠে বেতের এক ঘা বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা, বস গিয়ে সিটে।'

মাজেদ 'উরে বাবারে' বলে আর্তনাদ করতে করতে নিজের বেঞ্চে গিয়ে বসল। ততক্ষণে অরুণও তার কাজ সেরে এসে বেঞ্চে বসে পড়েছে।

কাদির স্যার তাঁর চেয়ারে ফিরে গেলেন। বললেন, 'তোরা বড় জ্বালাস রে। এবার একটা পান না খেলেই নয়।'

তিনি তাঁর পানের ব্যাগে হাত দিলেন। একটা পান বের করলেন। তাতে সুপুরি রাখলেন। চুন লাগালেন। এবার তিনি জর্দা নেবেন। জর্দার কৌটা হাতে নিয়েছেন...

মাজেদ আর অরুণ শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। কী হয়, কী হয়...

স্যার কৌটার মুখ খুললেন। কৌটার মধ্যে হাত দিলেন... নরম নরম লাগে কেন? জর্দা জিনিসটা তো এই রকম হতে পারে না।

তারপর তিনি কৌটাটা মুখের কাছে এনে দেখার চেষ্টা করলেন ভেতরে কী?

উরে বাবারে মারে মরে গেলাম রে... তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর হাঁ আটকে গেল। তিনি আর নড়ছেন না। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না। তাঁর হাতের কৌটা থেকে সবুজ সাপটা মাথা বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

পুরো ক্লাস সাপটাকে দেখে চিৎকার করে উঠল। পাশের ক্লাস থেকে ছেলেরা এসে উঁকি দিল। চিৎকার-চেঁচামেচিতে হেডমাস্টার ছুটে এলেন।

শোভনের দুষ্টুমির ধরন অরুণের মতো ভয়ঙ্কর নয়। একটু নিরীহ ধরনের। তবে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রশংসা করার মতো।

এই তো সেদিনের কথা। পরিত্যক্ত পাটের গুদামের ভেতরে শোভনদের খেলার জায়গা। পাটে চাপ দেওয়ার মেশিনটা পড়ে আছে, এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। 'মনে হয়, প্যাসকেলের সূত্র ব্যবহার করে চাপ দেওয়া হতো', এটা দেখে লিপটন বলেছে।

AMARBOI.COM

শোভন পাটের গুদামের ভেতরে একটা টুল ফেলল। তারপর তার ক্লাস ফাইভের বন্ধু সানজিদাকে বলল, 'তোর ভাইয়াকে নিয়ে আয় পাটের গুদামে। তোর ভাইয়ার ফটো তুলে দেব।'

সানজিদার ভাইয়ার নাম সফিকুল। সে পড়ে ক্লাস সেভেনে। সফিকুলের চোখেও চশমা। সে নিজেকে সায়েন্টিস্ট বলে দাবি করে। সে তার নিজের নাম রেখেছে আইজাক আলবার্ট সফিকুল।

নিউটন আর আইনস্টাইনের নামের প্রথম অংশ থেকে এই নামকরণ।

সানজিদা বলল, 'ভাইয়ার ফটো তুলবি মানে? তোর কাছে ক্যামেরা আছে?'

'হ্যাঁ। আমি একটা ক্যামেরা আবিষ্কার করেছি।'

'তুই ক্যামেরা আবিষ্কার করেছিস?'

'হ্যাঁ করেছি।'

'তাহলে আমার ফটো তুলবি না? খালি ভাইয়ার ফটো তুলবি?'

'হ্যাঁ। তোর ভাই তো বড় বিজ্ঞানী। আমার ক্যামেরায় কেবল যারা বড় বিজ্ঞানী তাদের ছবি ওঠে।'

সানজিদা তার ভাইকে নিয়ে এল। শোভনের সঙ্গে যথারীতি লিপটন, মাজেদ আর অরুণ।

তারা গেল সেই পাটগুদামের ভেতরে। বিশাল টিনে ছাওয়া একটা ঘর। শানের মেঝে।

একটা জুতার বাক্স কেটে ক্যামেরা বানানো হয়েছে। সেটা আবার রাখা হয়েছে ইট জোড়া দিয়ে বানানো একটা স্তম্ভের ওপর।

সামনে একটা টুল।

সেই টুলে বসানো হলো বৈজ্ঞানিক স্যার সফিকুলকে।

সামনে জুতার বাক্স কাম ক্যামেরায় হাত রেখে দাঁড়াল শোভন।

আর টুলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মাজেদ।

শোভন বলল, 'আমি ওয়ান বললে আপনি উঠে দাঁড়াবেন। টু বলার সঙ্গে সঙ্গে বসবেন। আর অমনি ফটো উঠে যাবে।'

সফিক বলল, 'তা কী করে হয়? ফটো তুলতে হলে তো লেন্স লাগবে। ফিল্ম লাগবে।'

AMARBOI.COM

শোভন বলল, 'আমার এই ক্যামেরায় লেন্স আর ফিল্ম সবই আছে।'

সফিক বলল, 'বুঝলি সানজি, কেন উঠতে হবে বসতে হবে। ভালো না ক্যামেরাটা। তাই এক সেকেন্ডের জন্য উঠে আবার বসতে হয়। ক্যামেরা ভালো হলে উঠ-বস করতে হতো না।'

শোভন হেসে বলল, 'সফিক ভাই। আপনি সত্যি একটা জিনিয়াস। রেডি ওয়ান...'

সফিক দাঁড়াল। অমনি মাজেদ সফিকের পেছন থেকে টুলটা সরিয়ে ফেলল।

শোভন বলল, টু। সফিক যেই না টুল ভেবে শূন্যে বসেছে, অমনি ধপাস করে সে পড়ে গেল শানের মেঝেতে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সানজিদা রেগে গেল। 'এই, আমার ভাইকে নিয়ে ফাজলামো। ডেকে এনে অপমান। শোভন, তোর সঙ্গে আড়ি। আর কোনো দিন যদি তোর সাথে কথা বলছি!'

AMARBOI.COM

লিপটনের দুষ্টুমি বিষয়েও কিছু কথা বলা দরকার।

লিপটন পরীক্ষার পড়া পড়ে না। তার যত উৎসাহ বাইরের বই পড়ায়। কিন্তু উদ্ভট উদ্ভট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তার স্বভাব।

পুকুরের ব্যাঙ ধরে তার পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে আবার পেটে ভরে পেটটা সেলাই করে সে ডেটল লাগিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয়। এরপর পুকুরপাড়ে এসে দেখে কোনো মড়া ব্যাঙ ভেসে ওঠে কি না!

পেয়ারাগাছের ডাল কেটে সেখানে লাগিয়ে দেয় তেঁতুলগাছের ডাল। পেয়ারাগাছে তেঁতুল ধরে কি না, এই বিষয় নিয়ে সে তখন চিন্তিত।

একবার সে লণ্ঠনের চিমনির মধ্যে কতগুলো জোনাকপোকা ভরে রেখেছিল। তার ধারণা ছিল হাজার হাজার জোনাক পোকা যদি লণ্ঠনের মধ্যে ঢোকানো যায়, তাহলে সেই আলোতেই বই পড়া যাবে। কিন্তু বিশটার বেশি জোনাকপোকা সে ধরতে পারেনি। তাই তার এই প্রজেক্ট সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি সেবার।

লিপটন বলল, 'শোভনের বদনা নামটা খুব ভালো। একটা আকিকা করা দরকার।'

মাজেদ বলল, 'ঠিক। কী জবাই করে এটা করা যায়।'

অরুণ বলল, 'একটা মুরগি ধরে ফেলি। সামনে দিয়ে যে মুরগিটা প্রথম যাবে, সেটাকেই ধরে ফেলব।'

'মুরগি ধরবি? কাজটা ঠিক হবে?' লিপটন বলল।

মাজেদ বলল, 'আরে ঠিক-বেঠিক দিয়ে চললে হবে। সবাই না বলে আমরা হলাম দুষ্টু ছেলের দল?'

লিপটন বলল, 'কিন্তু এখন তো আমাদের একটা ক্লাব হচ্ছে। সূর্যসেনা সংঘ। এখন মনে হয় আর মুরগি ধরে জবাই করে খেয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তার চেয়ে চল, এক কাজ করি, বাইগুনি বিলে প্রচুর পাখি পড়েছে। একটা সায়েন্টিফিক ফাঁদ বানিয়ে একটা পাখি ধরে ফেলি। তারপর সেটা দিয়ে আমাদের শোভনের বদনা নামের আকিকা হবে।'

'সায়েন্টিফিক ফাঁদ? তুই বানাবি?'

'হ্যাঁ, আমার নাম আইজাক আলবার্ট লিপটন না হতে পারে, আমি সায়েন্টিস্ট খারাপ না।'

লিপটন গালে হাত দিয়ে ভাবছে। বাকিরা বসে বসে মশা মারছে। লিপটনের ভাবনার সময় বাকিদের কথা বলা নিষেধ।

লিপটন গাল থেকে হাত নামাল। 'আসল কথা হলো, কাজটা হওয়া। আমরা পাখি ধরতে চাই। বাইগুনি বিলের পাখি। সেটা ধরতে পারলেই হলো। নে, সমাধান পাওয়া গেছে।'

'কী সমাধান?'

'শুনলে হতাশ হবি। কিন্তু পাখিটা ধরা পড়ার পর যখন শোভনের বদনা নামের আকিকা হবে, তখন আর তোদের হতাশা থাকবে না। তোরা আমার নামে স্লোগান দিবি।'

লিপটন আসলেই একটা ছোট্ট কাজ করল। তাদের বাসার ইঁদুর-ধরা কলটা নিয়ে এসে তাতে রাখল একটা জ্যান্ত কই মাছ। সেটা বিলের পানিতে আধাডোবা করে রেখে দিল সেইখানটায়, যেখানে পাখিরা আসে।

সকালবেলা ফাঁদ পাতল ওরা। তারপর বিপুল উৎসাহে বসে রইল হিজলগাছের ছায়ায়। কখন পাখি ধরা পড়ে।

একটা বালিহাঁস ধরা পড়ল। কী যে তার পাখার ঝাপটানি। ফাঁদটাসহই উড়াল দিল পাখিটা। ওরা সবাই হই হই করে উঠল।

শোভন বলল, 'স্যার আইজাক আলবার্ট লিপটন, আপনি এত কিছু ভাবতে পারলেন, ফাঁদ নিয়ে পাখি যে উড়াল দিতে পারে, সেটা ভাবলেন না?'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলের মাঠে পড়ে গেল পাখিটা।

সবাই দৌড়ে গেল পাখিটার কাছে।

পাখিটার ডান পায়ে ফাঁদের দাঁত বসে গেছে। রক্ত পড়ছে।

লিপটন দেখেই কেঁদে ফেলল।

বলল, 'শোভন একা বদনা না, আমরা সবাই বদনা।'

মাজেদ বলল, 'মানে।'

AMARBOI.COM

লিপটন বলল 'শোভন নিজেকে দাবি করেছিল সে বদ না। তাই পল্টু মামা তার নাম রেখেছেন বদনা। আজ আমি দাবি করলাম, আমরা কেউই বদ না। কাজেই আমরা সবাই বদনা। আমরা এই পাখিটাকে ছেড়ে দেব। বনের পাখি ধরে খাওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নাই। আমি একটা লেখা পড়েছি, পাখিরা আমাদের অনেক উপকার করে। পাখি না থাকলে পোকায় সারাটা পৃথিবী ছেয়ে যেত।'

'কী বলিস?' মাজেদ বিস্মিত। 'এত কষ্ট করে পাখিটাকে ধরলাম!'

'আমি এই পাখিটাকে ছেড়ে দেব। তবে দেবার আগে আমি ওর চিকিৎসা করব।' সে বেলেহাঁসটাকে ফাঁদ থেকে বের করে সোজা দৌড় ধরল।

অন্য সূর্যসেনারাও তার পিছে পিছে দৌড়াতে লাগল। বিল পেরিয়ে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গল। জঙ্গল পেরুলে ইট বিছানো সড়ক। সেখান থেকে সোজা সেবা ফার্মেসিতে। লিপটন বলল, 'ডেটল দিন তো। আরেকটু তুলা। আমি এই পাখিটার পায়ে ব্যান্ডেজ করে দেব।'

ওষুধের দোকানে বসে ছিলেন একজন মুরব্বি গোছের মানুষ। তিনি অনেক যত্ন করে নিজেই পাখিটার পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তারপর ওরা আবার দৌড় ধরল বিলের দিকে। বিলের পানিতে একটা গাছের ডাল পড়ে আছে। তার ওপর ছেড়ে দিল ওরা পাখিটাকে।

পাখিটা প্রথমে খানিকক্ষণ বসে রইল গাছের ডালে। তারপর উড়াল দিয়ে চলে গেল দূর আকাশে।

লিপটন স্লোগান ধরল। 'আমরা সবাই...'

বাকিরা জবাব দিল, 'বদ না।'

AMARBOI.COM

শোভনের আজকের দুষ্টুমি হলো, কাগজের টুকরায় 'পাত্রী চাই' কথাটা লিখে বন্ধুদের পিঠে সেঁটে দেওয়া। যার পিঠে এটা লাগানো হচ্ছে, সে টের পাচ্ছে না। এখানে-ওখানে সে এই বিজ্ঞাপনসহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই হাসছে। কেউ তাকে বলছে না, কেন বাকিরা হাসছে। ভয়াবহ ধরনের কৌতুক।

শোভনের নিজের পিঠেও একটা 'পাত্রী চাই' চিরকুট লিপটন লাগিয়ে দিয়েছে। শোভন অন্যদের পেছনে লেগে আছে। কিন্তু সে বুঝছে না, তার পিঠেও 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞপ্তি।

শোভনরা ক্লাস সিক্সে উঠেছে। তারা আর প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র নয়। হাইস্কুলের ছাত্র। তাদের প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস ফাইভের সব ছেলে এই স্কুলে এসে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছে। শুধু কাশেম আর গণেশ ছাড়া। কাশেম ফেইল করেছে। আর গণেশের বাবা ছেলেকে আর পড়াবেন না। গণেশ এখন থেকেই কাজে লেগে পড়েছে। সে সোনাতলা বন্দরে মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কাজ নিয়েছে।

আর তাদের ক্লাস ফাইভে যে ৭ জন মেয়ে ছিল, তারাও আলাদা হয়ে গেছে। তারা ভর্তি হয়েছে সালমা খাতুন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে।

আরেক জনের কথাও বিশেষভাবে বলতে হবে। তার নাম ফেলানি। সে ক্লাস ফাইভে পড়ছে তিন বছর ধরে। এর আগে ক্লাস ফোরেও ছিল দু বছর। তার কারণ হলো, মেয়েটা খানিকটা বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী। ওর মা গৃহপরিচারিকার কাজ করে খান। ফেলানি মায়ের বেশি বয়সের সন্তান। ফেলানির অন্য বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সব দূর দেশে থাকে। কেউ মায়ের খোঁজ খবর নেয় না।

ফেলানির জন্য শোভনদের খুব মায়া হয়। সে কথা বলে কম, ঠিকমতো বলতেও পারে না। কিন্তু তার একটা অপূর্ব গুণ আছে। সে সব কথাতেই হাসে। এই কারণে ফেলানিকে সবাই পছন্দই করে।

অঙ্ক ক্লাস। আবুল হোসেন স্যার অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। যোগ-বিয়োগের অঙ্ক।

এর মধ্যে অরুণ একটা কাগজের টুকরায় লিখল: শোভন+সানজিদা। এটা এখন শোভনের পিঠে লাগানো হবে।

এই সময় আবুল হোসেন স্যার হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'এই, তুই কী করিস?'

অরুণ বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ তুমি।'

'অঙ্ক করি স্যার।'

'কী অঙ্ক?'

'যোগ অঙ্ক স্যার।'

পাশে বসা তপু খিক করে হেসে উঠল।

আবুল হোসেন স্যার বললেন, 'এই তুই হাসিস কেন? দাঁড়া।'

তপু দাঁড়াল।

'হাসলি কেন?'

'হাসি নাই স্যার।'

'তাহলে আমি কি মিথ্যা বলছি? আমি স্পষ্ট দেখলাম তুই হাসছিস?'

AMARBOI.COM

'স্যার আমার মুখটাই হাসি হাসি। দাঁত বড় তো...'

স্যার হেসে ফেললেন। বললেন, 'বস। তোরা যা কথা শিখেছিস না? তোদের সাথে পারা মুশকিল।'

শোভন মুগ্ধ। আবুল হোসেন স্যার অঙ্ক বোঝান খুব ভালো করে। আর ছেলেদের সঙ্গে কথাও বলেন মিষ্টি স্বরে। এই রকম শিক্ষক হলে তো আপনাআপনিই পড়ায় মন বসে যায়। সে স্যারের কথার দিকে মনোযোগ দিল। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে অঙ্ক বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

ঠিক সেই সময়, বাইরে কী একটা হইচইমতো শোনা গেল।

কলেজ থেকে বড় ছাত্ররা এসেছে। হাইস্কুলের ছেলেদের মিছিলে নেবে।

মিছিল?

হ্যাঁ, মিছিল।

বসন্তের সেই দুপুরবেলা তারা সবাই বেরিয়ে পড়ল ক্লাসরুম থেকে। সবাই যোগ দিল মিছিলে। শোভন, লিপটন, অরুণ, মাজেদ–সবাই। আর সামনে দেখা গেল চশমা পরা মন্টুমামাকেও।

তারা স্লোগান দিতে লাগল, বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

AMARBOI.COM

ছেলেদের বেশির ভাগেরই পায়ে জুতা-স্যান্ডেল নেই। তাদের স্কুলের ইউনিফরম হলো সাদা পাজামা, আর ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট। কলেজের ছাত্ররা, যারা সামনে থেকে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের পরনে পায়জামা, গায়ে শার্ট। কারও কারও পরনে লুঙ্গি। একজন-দুজনের পরনে প্যান্টও আছে।

সোনাতলা একটা ছোট্ট বন্দর। ছোটখাট দোকানপাট। একটা বিল আছে। সেই বিলে শাপলা-শালুক ফুটে আছে। মাঠের মধ্যে ফণিমনসার গায়ে হলুদ রঙের ফুল। তারই পার ঘেঁষে পরিত্যক্ত পাটের গুদাম। ইট বিছানো রাস্তার দুধারে নানা ধরনের দোকানপাট। আর আছে একটা ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশন।

শোভন উচ্চরবে স্লোগানে কণ্ঠ মেলাচ্ছে। তার পিঠে তখন দুটো ছোট্ট চিরকুট–সানজিদা+শোভন আর পাত্রী চাই।

এদিকে পল্টুমামাও স্লোগানে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেছেন।

তিনি বললেন,

তোমার আমার ঠিকানা...

ওরা সবাই তার জবাবে বলল, পদ্মা মেঘনা যমুনা।

AMARBOI.COM

শোভনদের ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছবি আঁকে সাত্তার। তাকে বলা হয়েছে একটা কাঠের টুকরায় সে লিখবে 'সূর্যসেনা সংঘ'। এটা তারা তাদের স্কুলের মাঠে জোড়া আমগাছদুটোর একটার গায়ে লাগিয়ে দেবে।

বিকেলবেলা ছেলেরা অপেক্ষা করছে সাত্তারের জন্য। সাত্তারের চুল কোঁকড়ানো। সেই চুল সে সোজা করতে চায়। চুলে তাই বিপুল পরিমাণ শর্ষের তেল মাখে। তা দেখে শোভনরা বিস্মিত। কারণ তারা আবার চুল কোঁকড়া করতে চায়। হায়, জগতে যে যা চায়, সে তা পায় না, যা সে পায়, তা সে চায় না।

সাত্তার আসছে না। বিকেলের রোদ মরে আসছে। আমগাছের নিচে বসে আছে তারা। আমগাছে মুকুল এসেছে। মুকুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। দখিনা বাতাসও বইতে শুরু করল। চমৎকার পরিবেশ।

কিন্তু শোভনরা অস্থির। সাত্তার আসে না কেন?

লিপটন বলল, 'সাত্তার, চলে আয় সত্বর।'

অরুণ বলল, 'সাত্তার মনে হয় মাথায় শর্ষের তেল মাখছে। চুল সোজা না হওয়া পর্যন্ত সে আসবেই না।'

মাজেদ বলল, 'কুত্তার লেজ এক বছর চোঙার মধ্যে রাখলেও সোজা হয় না। সাত্তার যে কেন চেষ্টা করছে।'

এমন সময় দেখা গেল একটা সাইকেলের রডের নিচে পা ঢুকিয়ে সিটের ওপর ডান বগল রেখে প্যাডেলের ওপরে নিজের শরীরের ভর রেখে সাইকেল চালাতে চালাতে সাত্তার এসে হাজির।

শোভন বিস্মিত। এই বেঁটেখাটো সাত্তার সাইকেল চালানো শিখে গেল। আর সে এখনো সাইকেল চালানোই শিখল না। শিখবে কী করে। তাদের বাসায় কোনো সাইকেল যে নেই।

লিপটন বলল, 'সাত্তার, আমাদের সাইনবোর্ড কই?'

সাত্তার সাইকেল থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার সাথে চল। সাইনবোর্ডের দোকান চারুলেখায় সাইনবোর্ড লেখাতে দিয়েছি। ২০ টাকা লাগবে।'

মাজেদ বলল, 'হারামি, বিশ টাকা আমরা কই পাব?'

সাত্তার বলল, 'সবাই মিলে চাঁদা দেব। প্রত্যেকে এক টাকা করে দেবে। তাহলেই হয়ে যাবে।'

শোভন হতাশ গলায় বলল, 'আমার পক্ষে এক টাকা চাঁদা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'আমার কাছে দশ পয়সাও নাই', অরুণ হতাশ স্বরে বলল।

মাজেদ বলল, 'এক টাকায় দুই সের চাল হয়, এক সের গরুর মাংস। আমাদের দুই দিনের সংসার খরচ।'

লিপটন বলল, 'সাত্তার, তুই না নিজেই আর্টিস্ট। তুই তো নিজেই একটা কাঠের টুকরার ওপরে লিখতে পারতি। আট আনার রং কিনে আনলেই হতো!'

অরুণ বলল, 'আমরা এক আনা করে চাঁদা দিতে পারি। সবাই মিলে চাঁদা দিলে বড় জোর এক টাকা হবে। বিশ টাকা আমরা কোথায় পাব?'

AMARBOI.COM

সাত্তার বলল, 'আচ্ছা দিতে হবে না। যাহ্। আমার সঙ্গে একজন চল। আমি একা আনতে পারব না।'

মাজেদ সাইকেল ভালো চালাতে পারে। সে বলল, 'নে ওঠ। আমি যাচ্ছি।' বলে সে এগিয়ে গিয়ে সাইকেল ধরল।

মাজেদও সিটে উঠতে পারে না। সেও সাইকেলের নিচেই চড়ে। কিন্তু সামনে আরেকজনকে বসিয়ে চালানোর ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে। সে সাত্তারকে নিয়ে দিব্যি চলে গেল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই তারা ফিরে এল।

একটা সুন্দর সাইনবোর্ড। সাদার ওপরে লাল রঙে লেখা সূর্যসেনা সংঘ, সোনাতলা। স্থাপিত ১৯৭১ ইং। তার নিচে লেখা, আর্ট বাই আব্দুস সাত্তার।

সাত্তার বলল, 'শোন, চারুলেখা থেকে এটা লেখালে ঠিকই কুড়ি টাকা পড়ত। আমি নিজেই আর্ট করেছি। টিনের প্লেটটা চারুলেখার আর্টিস্ট সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। উনি আমার আগ্রহ দেখে ওনার ওখানেই কাজ করতে দিয়েছেন। রংতুলিও তার। আমার কাজ দেখে উনি বলেছেন, ভবিষ্যতে যেন তার দোকানে আমি ফ্রি কিছু কাজ করে দিই। সেই শর্তে উনি এটা আমাকে করতে দিয়েছেন। উনি বলেছেন, এই সাইজের সাইনবোর্ডের খরচ পড়ে কুড়ি টাকা। আমি তোদের বিনা পয়সায় করে দিলাম।'

শোভনরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। সত্যি, এত সুন্দর একটা সাইনবোর্ড বিনি পয়সায় পাওয়া গেল।

শোভন, মাজেদ, লিপটন, অরুণ মিলে সাত্তারকে ঘাড়ে তুলে নাচতে লাগল।

সাত্তার বলল, 'এই তোরা আমাকে এক শিশি শর্ষের তেল দিবি তো!'

পল্টুমামা এলেন সেই সময়ে। ওরা সাইকেলটাকে একটা আমগাছের সঙ্গে দাঁড় করাল। পল্টু মামা সাইকেলের রডে উঠে দাঁড়ালেন। সাত্তার আর মাজেদ সঙ্গে করে তার এনেছিল। সেটা দিয়ে আমগাছের কাণ্ডের সঙ্গে খুব

AMARBOI.COM

ভালো করে বাঁধা হলো সাইনবোর্ডটাকে। সাত্তার পকেট থেকে পেরেক বের করল। একটা ইটের টুকরা জোগাড় করে হাতে দেওয়া হলো পল্টু মামার। মামা ইট দিয়ে পেরেক গাঁথতে গিয়ে নিজের হাতের মধ্যে ইটের বাড়ি মারলেন। তারপর উ মাগো মরে গেলাম বলে সাইকেল থেকে পড়ে গেলেন নিচে। শোভন সাইকেল ছেড়ে মামার শুশ্রূষা করতে লাগল।

মামার আঙুল প্রায় থেঁতলে গেছে।

লিপটন দৌড়াতে লাগল বাগানের দিকে। গাঁদা ফুলের পাতা আনতে হবে। শানের মধ্যে গাঁদা ফুলের পাতা রেখে পাথরের টুকরা দিয়ে পিষতে হবে। সেই পেষা পাতা লাগানো হলে যেকোনো ক্ষত নিরাময় হবেই হবে। আরেকটা চিকিৎসা আছে। দূর্বাঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু গাঁদা ফুলের পাতা থাকতে আর কোনো কিছু ভাবারই দরকার নেই।

পল্টু মামা ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর চোখ গেল সাইনবোর্ডের দিকে। সাইনবোর্ডটা গাছের ডালে দিব্যি সুন্দরভাবে লাগানো আছে।

তাতে জ্বলজ্বল করছে সূর্যসেনা সংঘ লেখাটা। সূর্যের আলোকশিখাগুলো সাত্তার সত্যি ভালো এঁকেছে।

তিনি উঠে বসলেন, 'সাত্তার, তোকে আমি সত্যি সত্যি এক সের শর্ষের তেল কিনে দেব রে।'

AMARBOI.COM

ক্লাস হচ্ছে না। বন্দরের পথে পথে প্রায়ই মিছিল বের হয়। শোভনরাও সেই মিছিলে যোগ দেয়। তারা হাঁটে। তাদের সূর্যসেনা সংঘের সদস্য এখনো বেশি নয়। শোভন, লিপটন, মাজেদ, অরুণ, সাত্তার, শামসু আর পল্টুমামা (উপদেষ্টা)। তারা সবাই এখন এই নতুন মজাটা নিয়েই ব্যস্ত। মিছিলে যাওয়া।

বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

এক দাবি এক দফা, বাংলার স্বাধীনতা।

পল্টু মামা ভালো স্লোগান ধরতে পারেন।

সারা দিন তারা পথে পথে ঘোরে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে।

তাদের গলা বসে যায় স্লোগান দিতে দিতে। তাদের মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধূলিতে ধূসরিত।

বাঁশের লাঠি তৈরি করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

সূর্যসেনা সংঘের ছেলেরা তাদের আমগাছের নিচে বসেছে বিকেলবেলা। বাঁশের লাঠি তৈরি করার কাজটা তো তাদের করতে হবে।

তাদের হাইস্কুলের দপ্তরি রহমত চাচা তাদের আলাপ শুনছিলেন। বললেন, 'আমার সাথে চলেন। আমি জানি কোন বাঁশঝাড়ে ভালো বাঁশ আছে। কোন বাঁশে ভালো লাঠি হয়।'

ছেলেরা বলল, 'চলেন।'

রহমত চাচা বললেন, 'খাড়ান। দাওটা লইয়া আসি।'

রহমত চাচা একটা দা নিয়ে এলেন। সূর্যসেনারা চলল তাঁর পেছনে পেছনে। স্কুলভবনের পেছনে তারকাঁটার বেড়ার নিচে একটা জায়গায় মাটি নেই। তারই ফোকর দিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। পেছনের এই জায়গাটা জঙ্গলে ছাওয়া। ঢেঁকিশাকের জঙ্গল আর শটিবন। ফণিমনসা। হলুদ ফুলে ছাওয়া কাঁটাগাছ। তারই মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। একটা বাছুর আপন মনে তাকিয়ে আছে।

নানা ধরনের গাছগাছালি। অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। আনারসের গাছে লাল আনারস। রহমত চাচা বললেন, 'ওইটা কিসের গাছ চিনেন?'

'কিসের?' লিপটন বলল।

'ওইটা হইল জামালগোটা। ওইটা খাইলে তার আর বসা থাইকা উঠতে হইব না। হাগতে হাগতে ওইখানেই শ্যাষ।'

'তাই নাকি?' পল্টু মামার চোখেমুখে বিস্ময়।

'আর ওইখানে একটা গাছ আছে। বিলাই চিমটি। ওইটা দিয়া কী হয়, সেইটা জানেন?'

'কী হয়?'

'অর ফলটা ফাটায়া দিলে ভেতর থাইকা গুঁড়া বাইর হয়। সেইটা যদি কারও গায়ে লাগে, চুলকাইতে চুলকাইতে হে মইরা শেষ হইয়া যাইব।'

AMARBOI.COM

'বলেন কী?' পল্টুমামা চশমাটা নাকের ডগায় ঠিকভাবে বসিয়ে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তারা এগুতে থাকে। মাজেদের পায়ে কাঁটা বেঁধে। সে বসে পড়ে কাঁটা তোলে পা থেকে।

বাঁশঝাড়ে গিয়ে থামে তারা। রহমত চাচা ভালো লাঠি হয় এই রকম বাঁশ বাছাই করে কাটতে থাকেন।

দুটো বেজি দৌড়ে পালায়।

বাঁশঝাড়ের নিচে এই দিনের বেলাতেও ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

তারা অনেকগুলো লাঠি তৈরি করেছে। নাতিদীর্ঘ লাঠি।

সেই লাঠিগুলো একখানে বাঁধেন রহমত চাচা। তখন পল্টু মামা বললেন, দশের লাঠি একের বোঝা।

লিপটন বলল, 'তাহলে যার লাঠি সে সে নিলেই তো হয়।' তাই করা হয়। প্রত্যেকে দুটো করে লাঠি হাতে নিয়ে ফিরতে থাকে।

ওই জঙ্গলের ভেতরেই পায়ে চলা পথে সার বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে তারা স্লোগান ধরে, 'বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'

AMARBOI.COM

শোভন বলল, 'মা, আমাকে জয় বাংলার পতাকা বানিয়ে দাও।'

মা বললেন, 'জয় বাংলার পতাকা বানাব? কাপড় পাব কই?'

শোভন বলল, 'সবুজ শাড়ি কাটলেই তো মা সবুজ কাপড় হয়ে যাবে।'

শোভনের ছোটবোন শোভা বলল, 'লাল কাপড় আমার পুতুলের বাক্সে আছে।'

মা বললেন, 'হলুদ কাপড় তো নাই। আর বাংলাদেশের ম্যাপটাই বা আমি আঁকব কী করে?'

শোভন বলল, 'আমি এঁকে দিতে পারব মা। আমাদের ভূগোল বইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাপের ছবি আছে।'

মা বললেন, 'তা না হয় তুই এঁকে দিলি। কিন্তু কাপড়টা আমি পাচ্ছি কই?'

শোভনের বাবা গার্লস স্কুলের ড্রিল শিক্ষক। তার নাম মনিরুজ্জামান। তাদের সংসারে সবকিছু মাপা। তাদের আয় সীমিত, ব্যয়ও হিসাব করা।

একটা পয়সা বাড়তি খরচ করার কোনো উপায় নেই। কেউ তা করার কথা ভাবেও না।

এখন জয় বাংলার পতাকা বানানোর জন্য বাজারে গিয়ে একটা হলুদ কাপড় কিনে আনা হবে, সে কথা কেউ ভাবছেও না।

সোনাতলা বন্দরে শোভনদের বন্ধুদের সবারই অবস্থা প্রায় একই রকম। কারও বা টিনের ছাপরা, কারও বা দোচালা ঘর। কারও বা খড়ে ছাওয়া ঘর। মাটির মেঝে। এদের কারও বাবা কেরানি। কারও বাবা ছাপাখানার বাইন্ডার। একজন বন্ধু আছে ওদের, তার বাবা মুচি। ওরা সবাই এক ক্লাসে পড়ে। আর স্কুলের মাঠে এক সাথে খেলে। ফুটবল কেনার সামর্থ্যও ওদের নেই। ওরা জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলে।

এখন হলুদ কাপড় কোথায় পাওয়া যাবে?

একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করে ফেলতে পারবেন পল্টুমামা। তিনি এই বাসাতেই থাকেন।

মামাকেই শোভন ধরল, 'মামা, মামা, এক টুকরা হলুদ কাপড় জোগাড় করে দাও না।'

মামা চোখের চশমাটা হাতে নিয়ে বললেন, 'হলুদ কাপড় দিয়ে তুই কী করবি?'

শোভন বলল, 'কী আবার করব? জয় বাংলার পতাকা বানাব।'

পল্টু মামা বললেন, 'তাহলে তো একবার চেষ্টা করে দেখতেই হয়। চল, দর্জির দোকানে যাই।'

শোভা পড়ে ক্লাস থ্রিতে। সে বলল, 'আমিও যাব।'

শোভন বলল, 'না না, এটা বড়দের ব্যাপার। শোভা, তোর যাওয়ার দরকার নাই।'

শোভা বলল, 'আমি বড় হয়ে গেছি।'

শোভন বলল, 'তাহলে তুই একা যা। হলুদ কাপড় নিয়ে আয়।'

শোভা বলল, 'আমি একা যাব না। তোমাদের সঙ্গে যাব।'

শোভন বলল, 'আমরা পাঁচিল টপকে পার হয়ে যাব। তুই পাঁচিল পার হবি কী করে?'

AMARBOI.COM

শোভা বলল, 'আমাকে কোলে করে পাঁচিলে তুলবে। আবার কোলে করে তুলে নেবে।'

শোভন বলল, 'যে এখনো কোলে উঠতে চায়, সে কী করে বড় হলো?'

পল্টু মামা বললেন, 'আচ্ছা। চল ওকে নিয়েই যাই।'

ওরা তিনজন বাড়ি থেকে বেরোল। বেলা ১১টার মতো বাজে। তীব্র রোদ উঠেছে। বসন্তে গাছগাছালিতে নতুন পাতা এসেছে। কচি সবুজ পাতায় দখিনা বাতাস আর রোদ খেলা করছে। মাঠভরা চোরকাঁটা। তার ভেতর দিয়ে ওরা ছুটে চলেছে। মাঠ পেরুলে ইট বিছানো পথ। ওই দূরে রেললাইন। আরেকটু দূরে ছোট্ট রেলস্টেশন।

শোভনদের বাড়ি থেকে রেললাইন দেখা যায়। একটা ছোট্ট রেল সেতু আছে ওখানটায়। তার ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে। স্টিম ইঞ্জিন। ঝিকঝিক শব্দ তুলে রেলগাড়ি যায়। মাঝে মাঝে সিটি বাজায়–কু কু। কালো ইঞ্জিনের ওপরে চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয়। সেই ট্রেনের দিকে তাকিয়ে শোভনের মন কেমন করে। কারা যায় ওই রেলগাড়ি দিয়ে। কোথায় যায়?

তারা রাস্তায় উঠে পড়েছে। দ্রুতগতিতে হাঁটছে তাঁরা। তিনজনের পায়েই স্পঞ্জের স্যান্ডেল। পল্টুমামার পরনে লুঙ্গি। গায়ে একটা ছাই রঙের হাওয়াই শার্ট। শোভনের পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে একটা নীল রঙের শার্ট। শোভা পরেছে একটা লাল রঙের ফ্রক। তাকে মনে হচ্ছে একটা প্রজাপতি। সে বড়দের সঙ্গে হাঁটায় পারছে না বলে দৌড়ুচ্ছে। তার স্যান্ডেলে শব্দ হচ্ছে প্রজাপতির পাখা নাড়ার মতো।

মাঠ পেরিয়ে পাঁচিল। এটা পার হলে শর্টকাট হয়। তা না হলে অনেকটা ঘুরতে হবে।

শোভন লাফিয়ে উঠে পাঁচিলের মাথা ধরে ফেলল। তারপর বাঁদরের মতো ঝুলে উঠে গেল পাঁচিলের ওপরে। তারপর লাফ।

পল্টু মামা শোভাকে কোলে তুলে পাঁচিলের ওপরে রাখলেন।

শোভন বলল, 'শোভা লাফ দে।'

AMARBOI.COM

'না, মরে যাব।' শোভা নাকি সুরে বলল।

'তাহলে আমার ঘাড়ে পা রাখ।'

'না, মামা কোলে করে নামাবে।'

পল্টুমামা নিজে দেয়ালটা পার হয়ে তারপর শোভাকে কোলে করে নামালেন।

তারা বন্দরের বাজারের কাছে পৌঁছে গেল। খলিফা বা দর্জির দোকানটা কাঠের পাটাতনের ওপর। একটু উঁচু। খলিফা চাচার থুতনিতে দাড়ি, মাথায় গোল টুপি। চোখে গোল চশমা। তার সেলাই মেশিনটা খটখট শব্দ তুলে নড়ছে। শোভা বিস্ময়মাখা চোখে তাকিয়ে রইল্। কীভাবে খলিফা চাচার পা নড়ছে। চাকা ঘুরছে। আর মেশিনের সুঁই ঢুকে যাচ্ছে কাপড়ের মধ্যে। তাতেই সেলাই হয়ে যাচ্ছে। সুইটা তো কাপড়টাকে এফোড় ওফোড় করছে না। একদিক দিয়ে ঢুকছে। তাহলে কাপড়ের উল্টো পিঠ দিয়ে সুতাটা এই পারে আসছে কী করে? সে বলল, 'মামা, মামা, মেশিন দিয়ে সেলাই হচ্ছে কী করে? মা যখন সেলাই করেন তখন পুরো সুইটা কাপড়ের ওই পিঠে যায়, তারপর এই পিঠে আসে। মেশিনের সুঁই তো এক পাশেই থাকে। তাহলে?'

AMARBOI.COM

পল্টুমামা প্রথমে কথাটা শোনেননি। তিনি খলিফা চাচার কাছে হলুদ কাপড় কীভাবে চাওয়া যায়, তাই ভাবছেন। শোভা আবারও বলল, 'মামা, সুঁইটা কাপড়ের ওই পিঠে পুরোটা যাচ্ছে না, তবুও সেলাই হচ্ছে কী করে? সুতাটা ওই পিঠে গিয়ে এক ফোঁড় পরে আবার এই পিঠে আসছে কী করে?'

পল্টুমামা এবার প্রশ্নটা শুনলেন। তারপর বললেন, 'তাই তো রে। এইভাবে তো ভাবি নাই। সুইটা গোটাটা ওপারে না যাওয়া সত্ত্বেও সেলাই হচ্ছে কী করে? তুই তো মা আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিলি।'

পল্টুমামা বলেন, 'মুরব্বি, আমার ভাগ্নি একটা কঠিন প্রশ্ন করেছে। আমার উত্তরটা জানা নাই। আপনি কি বলতে পারেন, সুঁইটা এক পিঠ দিয়ে ঢুকছে, হাতে সেলাই করা সুইয়ের মতো গোটাটা ওই পিঠে যাচ্ছে না, তাহলে সেলাইটা হচ্ছে কেমন করে?'

খলিফা চাচা হাসলেন। বললেন, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।'

'তা তো হলো ুরব্বি', পল্টুমামা মাথা চুলকে বললেন, 'কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছাটা কাজ করছে কোন মেথডে?'

খলিফা চাচা আবার হাসলেন, 'ববিন দিয়া, খালি এইটা জানি। আমরা অশিক্ষিত মানুষ এত কি আর জানি। তবে আপনার ভাগ্নির মাথায় মাশাল্লাহ অনেক বুদ্ধি। আল্লাহ তারে ব্রেইন দিছে। আমি তার জন্য দোয়া করি।'

পল্টুমামা বললেন, 'চাচা, একটুখানি হলুদ কাপড় হবে আপনার কাছে? আমরা একটা বাংলাদেশের পতাকা বানাব। লাল সূর্যের মাঝখানে বাংলাদেশের হলুদ ম্যাপ দিতে হয়। আপনার কাছে আছে হলুদ কাপড়?'

খলিফা চাচা খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'মিথ্যা কথা কই কেমনে। একটা হলুদ ম্যাপ বানায়া রাখছি। পতাকা তো দিনে কয়েকটা বানানোই লাগে। আপনের এই ভাগ্নিটার কথা শুইনা আমি খুশি হইছি। লন।'

'চাচা, এইটার দাম দেওয়ার মতো অবস্থা এখন আমাদের নাই। কত দাম বলেন। আমরা পরে দিয়ে যাব।' পল্টুমামা বললেন।

'দাম দিতে হইব না। আপনেরা পতাকাটা আকাশে উড়াইবেন। জয় বাংলা বইলা শ্লোগান ধরবেন। আমার তাতেই দাম দেওয়া হইয়া যাইব।'

ওরা চোরকাঁটা ভরা মাঠ পেরিয়ে ছুটছে। শোভার হাতে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। তারা দৌড়ুচ্ছে না, যেন উড়ছে। তারা প্রত্যেকেই যেন একেকটা প্রজাপতি।

মাঠের মধ্যে ফড়িঙের ঝাঁক।

শোভন বলল, 'আজকে মনে হচ্ছে ফড়িঙের হাটবার। এখানে মনে হয় হাট বসেছে। এত ফড়িং আজ উড়ছে মাঠের আকাশে।'

মা সবুজ রঙের শাড়ি কাটলেন। লাল কাপড় শোভার পুতুলের বাক্সে ছিল। গোল করে কাপড় কাটা খুব মুশকিল। শোভন একটা উপায় বের করল। একটা সাদা কাগজ প্রথমে চার ভাঁজ করল। তারপর তাতে পেনসিল দিয়ে বৃত্তচাপ আঁকল। সেটা খুলতেই একটা মোটামুটি আকারের বৃত্ত পাওয়া গেল। তাতে হাত ঘুরিয়ে সেটাকে একটা সুন্দর বৃত্তের রূপ দেওয়া গেল। কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে একটা সুন্দর বৃত্ত পাওয়া গেল। সে কাগজটাকে

AMARBOI.COM

কাপড়ের ওপর রেখে মা পেনসিল দিয়ে দাগ কাটলেন। তারপর কাঁচি চালালেন।

বাংলাদেশের পতাকাটা তৈরি হলে সবার মন ভরে গেল। কী সুন্দর এই পতাকাটা। সবুজের মধ্যে লাল সূর্য। তার মধ্যে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র।

একটা বাঁশের মাথায় পতাকাটা বাঁধা হলো। তারপর তিনজনে–শোভন, শোভা আর পল্টু মামা–বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তারা চিৎকার করতে লাগল 'জয় বাংলা'। শিগগিরই ছোটদের দল তাদের সঙ্গে জুটে গেল।

লিপটন, মাজেদ, সাত্তার, সানজিদা, তার ভাই বৈজ্ঞানিক সফিক, এমনকি গণেশ আর কাশেমও চলে এসেছে রাস্তায়। ওই পতাকার পেছনে।

তারা শ্লোগান ধরেছে:

ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা।

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

অরুণ তাদের লাঠিগুলো নিয়ে চলে এল। সবার হাতে একটা করে লাঠি।

বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

শহীদের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না।

এক দাবি এক দফা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

AMARBOI.COM

মিছিল শেষ করে তারা এসে সমবেত হলো স্কুলের মাঠে, জোড়া আমগাছের নিচে। যেখানে তাদের সাইনবোর্ড ঝোলানো।

সূর্যসেনা সংঘ।

সূর্যসেনা সংঘের সভ্যদের দিনগুলো দারুণ কাটছে। লুকোচুরি নয়, কানামাছি নয়, ফুটবল নয়, তারা মজে গেছে এক নতুন খেলায়।

মিছিল মিছিল খেলা।

২৬ মার্চ থেকে দেশ স্বাধীন। অন্তত সোনাতলা স্বাধীন। সারা বন্দরে দুদিন আগে কালো পতাকা তোলা হয়েছিল। কারণ ওই দিন ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। পাকিস্তানের পতাকা না তুলে প্রতিটি দোকানে, অফিসে, বাড়িতে ওড়ানো হলো কালো পতাকা। আর বাংলাদেশের লাল হলুদ সবুজ নতুন পতাকা তো আছেই।

ঢাকায় পাকিস্তানি সেনারা হামলা চালিয়েছে। শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। না, শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। চট্টগ্রামে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। তিনি আত্মগোপন করেছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন। পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে হবে। সারা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তো বলেই দিয়েছেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।

সোনাতলাবাসী তা-ই করছে। যার যার যত পাখিমারা বন্দুক ছিল, তাই নিয়ে তারা মহড়া দিচ্ছে। আর আছে বাঁশের লাঠি। সকাল-বিকেল পালা করে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে রেলস্টেশন। সোনাতলা এখন মুক্ত। স্বাধীন।

শোভন আর পল্টুমামা সকালে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তাদের দুপুর গড়িয়ে গেল। রেলস্টেশনের সামনে জয় বাংলার লোকদের বন্দুক রাইফেল লাঠি হাতে পাহারা দিতে দেখল তারা। কলেজের মাঠে দেখল স্কাউটের নকল বন্দুক কাঁধে সংগ্রাম কমিটির লোকদের মার্চপাস্ট।

পল্টু মামা বললেন, 'বুঝেছিস শোভন, আমাদের কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে কেমিক্যাল বের করে নিয়েছে ছেলেরা। তারা বোমা বানাচ্ছে। পাকিস্তানি মিলিটারি এলে ছেলেরা তাদের ওপর বোমা মারবে।'

শোভন বলল, 'মামা, তুমি গেলে না বোমা বানাতে?'

মামা বললেন, 'না রে। আমি তো আর্টসের ছাত্র। কেমিস্ট্রি বুঝি না। আমি তো বোমা বানাতে পারি না।'

মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে ছিলেন পথের দিকে। ওরা ফিরতেই তিনি গজর গজর শুরু করলেন, 'এই তোরা কোথায় কোথায় থাকিস। দিনকাল ভালো না। ঢাকায় খুব গোলাগুলি হয়েছে। এই দিকেও মিলিটারি আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। তোরা বাইরে থাকিস কেন এত বেলা? দুপুরে ভাতটা তো খেতে হবে, তাই না?'

AMARBOI.COM

খুব গরমও পড়েছে। রোদটাও ভীষণ চড়া। তাদের উঠোনের শজনেগাছে একটা কাক কা কা করেছে। শোভন আর পল্টু টিউবওয়েলের পাড়ে গিয়ে হাতমুখ ধুল।

ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ তাদের খুব ভালো লাগল।

তারা রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসল। পিঁড়ি পেতে বসল তারা। তাদের সামনে টিনের থালায় ভাত বেড়ে দিলেন শোভনের মা।

ভাত, ছোট মাছের চচ্চরি, ঢেঁকিশাক আর ডাল।

একটা বিড়াল এসে রান্নাঘরে তাদের সামনে মিউ মিউ করতে লাগল। পল্টুমামা মাছের কাঁটা ছুড়ে দিলেন বিড়ালটার দিকে।

এই সময় হঠাৎ করে গুলির শব্দ।

তারপর একটা হইহই রব। মিলিটারি এসেছে। মিলিটারি।

সবাই দৌড়ে পালাচ্ছে।

মিলিটারি এসেছে? এখন কী হবে?

মা তাদের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে গেটের দরজা ঠেলে সামনে তাকালেন। সবাই পড়িমরি দৌড়াচ্ছে।

ঘর থেকে শোভা দৌড়ে বেরিয়ে এল, ভয়ার্ত মুখে বলল, 'মা কী হয়েছে?'

একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে শোভনের মাকে বলল, 'মিলিটারি আসছে। সবাই বিলের ওই পাড়ে যাচ্ছে। আপনারাও পালান।'

আবার গুলির শব্দ। কাক ডেকে উঠল তারস্বরে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মা তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে উঁকি দিলেন। শোভনের বাবা তখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। তাকে তিনি ধাক্কা দিয়ে তুললেন, 'ও গো ওঠো। চলো। মিলিটারি এসেছে। এখনি পালাতে হবে।'

মনিরুজ্জামান সাহেব ধড়মড়িয়ে বিছানা ছাড়েন। 'কী হয়েছে? মিলিটারি এসেছে?'

পল্টুমামা আর শোভন আধোয়া হাতেই ছুটছে। শোভাকে এক হাতে ধরে ছুটছেন মা। তাদের বাবা ড্রিল মাস্টার মনিরুজ্জামান সাহেব সবার আগে, তিনি বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন।

মিলিটারি কতদূর এল?

তারা বাইগুনি বিল পেরিয়ে যাচ্ছে। বিলের একটা জায়গায় হাঁটুপানি। তারপর আলপথ। দুই ধারে আউশের খেত। সেই পানি ভেঙে তাঁরা ছুটছেন। বাবা কোলে তুলে নিয়েছেন শোভাকে।

বিল পেরুলে মুচিপাড়া। এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। হিন্দুদের ওপর মিলিটারিদের বেশি রাগ।

মুচিপাড়া পেরিয়ে তারা ছুটতে লাগল। মুচিপাড়ার কুকুরগুলো তাদের পেছনে পেছনে ছুটছে ঘেউ ঘেউ করতে করতে। সামনে-পেছনে মানুষ,

AMARBOI.COM

সবাই পালাচ্ছে। তাদের পদশব্দে সচকিত চারপাশ। দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে বাছুর। কককক করে ডেকে উঠছে মুরগিছানা।

নিজের বুকের শব্দে নিজেই কেঁপে উঠছে মানুষ।

তারপর একটা বিশাল আমবাগান। সেই আমবাগানে আসার পর দেখা গেল আরও অনেকেই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

শোভনরাও সেখানে গাছের নিচে গিয়ে বসে পড়ল।

শোভনের বুক কাঁপছে।

দূর থেকে গুলির শব্দ আসছে।

বাবা বললেন, 'এই শো। শুয়ে পড় সব। গুলি মাটি থেকে দেড় হাত ওপর দিয়ে যায়। শুয়ে থাক। তাহলে আর গুলি লাগবে না।'

শোভন মাটিতে শুয়ে আছে। গাছের নিচে, ঘাসের ওপরে। তার পা কেটে গেছে। দুপায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, এক পায়ে আছে, আরেক পায়ে নাই।

তার মাথার কাছে একটা কেন্নো কুঁকড়ে আছে।

শোভাও শুয়ে আছে, উপুড় হয়ে, তার পাশে। শোভা বলল, 'ভাইয়া, আমাদের পতাকাটা?'

তাই তো। ওদের লাল সবুজ হলুদ পতাকাটা ওরা ওদের টিনের চালের ওপর টাঙিয়ে রেখেছে।

মিলিটারি যদি ওই পতাকাটার দিকে গুলি ছোড়ে?

হঠাৎ করে পল্টুমামা উঠে বসলেন।

বললেন, 'আমি যাব। ওই পতাকাটা আমি নিয়ে আসব। ওই পতাকাটাকে যদি ওরা গুলি করে, আমি সেটা সহ্য করতে পারব না। আমি যাব।'

পল্টুমামার পাশেই শুয়ে ছিলেন শোভনের বাবা মনিরুজ্জামান সাহেব। তিনি উঠে বসলেন। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন পল্টুমামার গালে। বললেন, 'চুপ হতভাগা। শুয়ে থাক। পতাকা টাঙানোর সময় হুঁশ ছিল না। এখন কেন খুলতে চাচ্ছিস। সাহস থাকলে যা, ওদের সাথে যুদ্ধ কর। যা।'

পল্টুমামা বললেন, 'তাই যাব।'

AMARBOI.COM

সারাটা বিকেল তারা ওই আমবাগানে পড়ে রইল। শোভনের হাতে তখনো ভাত আর তরকারির গন্ধ। তারা কেবল ভাতের পিঁড়িতে বসেছিল। খাওয়া কেবল শুরু হয়েছিল। সেই সময় এই 'মিলিটারি এসেছে মিলিটারি এসেছে' রব। খাওয়া শেষ করতে পারেনি তারা। হাতটাও ধুতে পারেনি।

সন্ধ্যার আগে আগে খবর এল, মিলিটারি মাইকিং করেছে। প্রত্যেককে নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। যে বাড়ি ফাঁকা পাওয়া যাবে, সেই বাড়িতে আগুন দেওয়া হবে। যারা পালিয়ে থাকবে, তাদের ধরতে অভিযান পরিচালনা করা হবে। যদি পলাতক কাউকে ধরা যায়, তাহলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

সবাই উঠে বসল।

'কী করা হবে এখন?'

শোভনের বাবা শিক্ষক। তার কাছেই আসেন অনেক মুরব্বি। তাদের সবার চোখে-মুখেই ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা।

এখানে এই আমবাগানে পড়ে থাকারও কোনো মানে হয় না।

ফিরে তো যেতেই হবে। সবাই এক বস্ত্রে যে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই চলে এসেছে।

কারও সঙ্গে কোনো বাড়তি কাপড়চোপড় নেই। পকেটে কোনো পয়সা নেই। বাড়িঘরেও কেউ তালা দেয়নি। এ অবস্থায় তারা কোথায় যাবে?

'আল্লাহর নাম নিয়ে চলুন ফিরে যাওয়া যাক।'

তারা ফিরে গেল যার যার বাড়িতে।

AMARBOI.COM

বাবা বললেন, 'শোভন, তোমাদের সূর্যসেনা সংঘের সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ফেলো।'

শোভন বলল, 'কেন বাবা?'

বাবা শোভনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সূর্যসেনা কথাটার মধ্যে সেনা কথাটা আছে। ওরা ভাববে এটা মুক্তিসেনাদের দল।'

'ভাবলে ভাববে! ওরা ভাবলে তো আমাদের কিছু করার নাই। তাই না?'

'ভাবলে ভাববে মানে। তারপর খোঁজ নেবে কারা এটা করেছে। তারপর বাসায় এসে আমাদের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলবে।'

'তাহলে আমরা কী করব?'

'সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলবে। মিলিটারিদের চোখ পড়ার আগেই এই কাজটা তোমাদের করতে হবে।'

শোভনরা আর আগের মতো বিকেলে খেলতে হাইস্কুলের মাঠে যায় না। তাদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাইমারি স্কুলে পাকিস্তানি মিলিটারি ক্যাম্প বসিয়েছে।

স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেছে।

এর মধ্যে তাদের সাইনবোর্ডটা হাইস্কুলের জোড়া আমগাছটায় টাঙানো আছে। এটা এখন নামাতে হবে!

বিকেলবেলা সূর্যসেনা সংঘের সভ্যরা সমবেত হলো পাটগুদামে। এই জায়গাটা পরিত্যক্ত। জঙ্গলের পেছনে। মিলিটারি এই জায়গাটার খোঁজ পাবে না বলেই মনে হয়।

লিপটন, মাজেদ বসেছে হাইড্রলিক প্রেসার দেওয়ার লোহার বিশাল পাতটায়। অরুণ সেটার বিশাল হ্যান্ডেলটা ঘোরানোর চেষ্টা করছে।

সাত্তার বসেছে মেঝেতে। নিজের স্যান্ডেল মেঝেতে বিছিয়ে সে তার ওপর বসেছে।

শোভন এল।

বলল, 'এই শোন। বাবা বলেছেন আমাদের ক্লাবের সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলতে। সূর্যসেনা দেখলে নাকি মিলিটারি ভাববে মুক্তিসেনা। তখন নাকি আমাদের খুঁজতে বাড়ি বাড়ি যাবে। আমাদের মেরে ফেলবে।'

সাত্তার বলল, 'আমার আব্বাও তা-ই বলেছেন। বলেছেন, যা এখনই গিয়ে সাইনবোর্ডটা খুলে ফেল। তারপর মাটির নিচে পুঁতে রাখ। না হলে বিলের পানিতে ফেলে দে। না হলে নাকি আমাকেই ধরবে। আমি আবার এর আর্টিস্ট কি না। ছোট করে তো আবার লিখেও দিয়েছি, আর্ট বাই আব্দুস সাত্তার। আমাকে ধরা হবে সবচেয়ে সহজ।'

লিপটন বলল, 'আর সাত্তারকে ধরলে আমাদের সবাইকে ধরে ফেলতে পারবে।'

অরুণ বলল, 'আমাকে ধরবে সবার আগে। ওরা আবার হিন্দু দেখলেই তাকে মেরে ফেলে। আমাদের মনে হয় ইন্ডিয়া চলে যেতে হবে।'

মাজেদ বলল, 'তাহলে চল যাই। সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলি।'

AMARBOI.COM

লিপটন বলল, 'খুলতে তো হবেই। আমরা তো আবার মিছিলও কম করিনি। সূর্যসেনা ক্লাবের ছেলেদের ধরলে ওরা ছাড়বেই না। মেরেই ফেলবে। কিন্তু সবাই দল বেঁধে যাওয়া যাবে না। একজন গিয়ে সাইনবোর্ডটা খুলে ফেলতে হবে।'

অরুণ বলল, 'লাগানোর সময় তো পল্টু মামা লাগিয়ে দিয়েছিল। সাত্তারের সাইকেলটা সাথে ছিল। এবার কী হবে?'

মাজেদ বলল, 'গাছে ওঠা আমার জন্য খুবই সোজা কাজ। আমি বুক বেয়ে সুপারিগাছে উঠতে পারি। আর এটা তো আমগাছ।'

শোভন বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে মাজেদ যাক। আর তার সাথে আমি যাই।'

শোভন আর মাজেদ চলল স্কুলের দিকে। পাটের গুদাম থেকে স্কুলটা বেশি দূরে নয়। মধ্যখানে জোড়া পুকুর। দুই পুকুরের মধ্যখান দিয়ে যাওয়া যায়। এটা হলো সংক্ষিপ্ত পথ।

পুকুরে শাপলাফুল ফুটে আছে। পরিষ্কার পানিতে পুঁটি মাছের পিঠে রোদ পড়ে ঝিলিক উঠছে।

AMARBOI.COM

শোভন আর মাজেদ দৌড় ধরল স্কুলের দিকে। তারকাঁটার বেড়ার একটা জায়গায় তার ঝুলে আছে। সেখান দিয়ে তারা ঢুকে পড়ল মাঠে। তারপর জোড়া আমগাছতলায়। মাজেদ আসলেই খুব ভালো গাছে উঠতে পারে। সম্ভবত বাঁদরেরাও এই ব্যাপারে ঈর্ষা করবে মাজেদকে।

কোনো একটা জিনিস গড়া কঠিন। ভাঙা সহজ। এই একটা সাইনবোর্ড লাগাতে কত কাঠখড়ই না তাদের পোড়াতে হয়েছে। সাত্তার কত কষ্ট করে এটা লিখেছে। পল্টু মামা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর রক্ত এই মাটিতে ঝরেছে। অথচ জিনিসটা খুলে ফেলতে এক লহমাও লাগল না। মাজেদ তড়তড়িয়ে উঠল। সাইনবোর্ডের পেছনের তারটা খুলে ফেলে এক হাতে সাইনবোর্ড ধরে দিব্যি বাঁদরের মতোই নেমে এল।

এখন তারা সাইনবোর্ডটা কী করবে?

তারা বিলের পানিতেই সাইনবোর্ডটা ফেলে দেবে বলে ঠিক করল। ছুটে চলল বিলের দিকে।

বিলের এই জায়গাটা গভীর। পানি রেলসেতুর নিচ দিয়ে এখানে বয়ে আসে। একটা চোরাস্রোত আছে।

সাইনবোর্ডটা ফেলতে গিয়েই চমকে উঠল ওরা দুজন।

ইমা! বিলের পানিতে এটা কার লাশ?

চিৎ হওয়া লাশ। পেটটা ফুলে উঠেছে।

এ যে খলিফা চাচা।

এই খলিফা চাচা তাদের জন্য পতাকার কাপড় দিয়েছিলেন। তিনি অনেক পতাকা বানিয়েছিলেন জয় বাংলার জন্য। অবশ্য একদিন কালো পতাকা দিবস হয়েছিল, তার আগে তাঁকে বানাতে হয়েছে অনেক কালো পতাকা।

তাকে কে মেরে ফেলল?

কী তার অপরাধ?

বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে দিয়েছেন শত শত, হয়তো এটাই তাঁর অপরাধ।

AMARBOI.COM

শোভন আর মামা এক বিছানায় শোয়। আজকেও শুয়েছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে সেই বৃষ্টি রিমঝিম শব্দ তুলেছে। ঘরটা পুরোই অন্ধকার। রাত আটটা কি নয়টা হবে।

পল্টু মামা রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অন করলেন। রেডিওতে খবর হচ্ছে।

মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছে। তারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকৃত এলাকায়ও মুক্তিবাহিনী হামলা চালাচ্ছে। পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটছে।

আবার পাকিস্তানি বাহিনী বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। নির্বিচারে মানুষ মারছে।

চরমপত্র অনুষ্ঠানটা শোভনের সবচেয়ে প্রিয়। *ঠাস কইরা একটা আওয়াজ হইল। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। আমগো কুর্মিটোলার মাইদ্দে*

জেনারেল পিঁয়াজি সাবে চেয়ার থনে পইড়া গেছিল। ... এদিনকার কারবার হুনছেননি? গেলো পরশু দিন ফেনীর কাছে এক ট্রাক মছুয়া সোলজার যাইতেছিল, গেরাম লুটকরনের লাইগা। আহারে.. হে গো আলাদা না পাইয়া বিচ্ছুগুলা হেগো ভাবিশ করছে।

বাইরে খুট করে শব্দ হলো। অমনি রেডিওর আওয়াজ কমিয়ে দিলেন পল্টুমামা।

তারপর দরজায় ঠকঠক শব্দ।

কে এল?

মা উঠে এই ঘরে এলেন। বাবাও।

এত রাতে কে?

মা বললেন, 'ওগো তুমি তো চাকরিতে যাচ্ছ না। ওরা অর্ডার করেছে সবাইকে জয়েন করতে হবে। তোমাকে নিশ্চয়ই ধরতে এসেছে। তুমি লুকাও।'

AMARBOI.COM

মা বাবাকে লুকানোর জন্য জায়গা খুঁজছেন। উপায় কী। দরজা খুললেই যদি দেখা যায় অস্ত্র হাতে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ঘর। ওপরে টিন। কাঠের কবাট, চৌকাঠ। মিলিটারিদের জন্য এই ঘর পুড়িয়ে দেওয়া সবচেয়ে সোজা।

মা দরজা খুললেন। দেখলেন, আঙিনায় কেউ নেই। তিনি তাড়াতাড়ি বাবাকে নিয়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলের মধ্যে বসিয়ে দিলেন।

গেটে তখন খটখট আওয়াজ বাড়ল।

তারপর আস্তে আস্তে ডাক, শোভন, শোভন।

বাচ্চা ছেলের কণ্ঠে ডাক।

শোভন-পল্টু মামা একযোগে গেটের কাছে গেল। বাঁশের বেড়া। আর ড্রাম কাটা টিনের গেট।

গেট খুললেন শোভনের মা।

অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এতক্ষণে চোখ ধাতস্থ হয়েছে। অন্ধকারের ভেতরেই দেখা যাচ্ছে অরুণ গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

কী হয়েছে অরুণ? শোভনের মা উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করলেন।

অরুণ শোভনের মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, মাসীমা...

মা তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। পেছনে পেছনে শোভন আর পল্টু মামা।

অরুণ বলল, 'মিলিটারি আমাদের বাড়িতে এসেছে। আমি পালিয়ে এসেছি। আর জানি না, বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না...'

অরুণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন।

পল্টুমামা বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গেলেন। শোভনের বাবা ওখানে জঙ্গলের মধ্যে বসে আছেন। মশা মারছেন, শব্দ হলো।

AMARBOI.COM

পল্টুর পদশব্দ পেয়ে তিনি গলা খাঁকারি দিলেন।

পল্টুমামা বললেন, 'দুলাভাই, আপনি ওঠেন।'

'মিলিটারি চলে গেছে?' বাবা ভীত কণ্ঠে বললেন।

পল্টুমামা বললেন, 'মিলিটারি না। অরুণ এসেছে।'

'কোন অরুণ?'

'শোভনের বন্ধু অরুণ।'

'কেন এসেছে।'

'মিলিটারি ওদের বাসায় হামলা করেছে। ও জানে না বাসার কী অবস্থা। ওর মা-বাবার কী অবস্থা। ও নিজে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে।'

'কী বলিস গাধা কোথাকার? উল্টাপাল্টা বলবি না।'

'না, উল্টাপাল্টা বলছি না। চলেন, অরুণকে দেখবেন।'

'অরুণকে দেখে আমি কী করব? ওকে এখনই বাড়ি থেকে বের করে দে। ওর খোঁজে মিলিটারিরা এখানে চলে আসবে।'

'আচ্ছা, আপনি চলেন ঘরের ভেতরে। আপনি বের করে দেন। মশা কামড়াচ্ছে, উঠছেন না কেন?'

বাবা উঠলেন। সত্যি মশা খেয়ে তাকে শেষ করে ফেলেছে।

তিনি বললেন, 'শোনো, জান বাঁচানো ফরজ। হাশরের ময়দানে কে কাকে চিনবে। বাবা তার ছেলেকে চিনবে না, ছেলে বাবাকে চিনবে না। আজকে দেশে রোজ কেয়ামত হয়ে গেছে। হাশরের ময়দানের মতো সূর্য মাথার দেড় হাত ওপরে চলে এসেছে। এখন কে কাকে আশ্রয় দেবে। অরুণকে এখনই বের করে দিতে হবে। সে অন্য কোথাও যাক। দুনিয়ায় জায়গার তো অভাব নাই।'

মনিরুজ্জামান ঘরের ভেতরে গেলেন।

ঘরের ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। তার আলোয় তাঁর চোখ পড়ল অরুণের দিকে। অরুণের চোখে জল। সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'বাবা, বাবা, মা, মা।'

শোভনের বাবা অরুণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি তোর বাবা রে অরুণ। আমি তোর বাবা।'

বাবা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

মা বললেন, 'এই শব্দ কোরো না। শব্দ না করে কাঁদা যায় না?'

AMARBOI.COM

সকালবেলায় দুধওয়ালা বলল, 'মা গো, তাড়াতাড়ি দুধটা লন মা। তাড়াতাড়ি ঘরে যাই। শুনছেন তো হরিপদ আর তার বউয়ের লাশ রেললাইনের ব্রিজের নিচে পইড়া আছে।'

অরুণ আর কথা বলছে না। সে একেবারে নীরব হয়ে গেছে। হরিপদ তার বাবার নাম।

শোভন তার হাত ধরে বসে রইল।

শোভা অরুণের মাথায় চিরুনি চালাচ্ছে। অরুণ তবু কোনো কথা বলছে না।

পরের দিন সকালবেলা শোভনের ঘুম ভাঙলে সে তার এক পাশে দেখল অরুণ ঘুমে কাতর। আরেক পাশে দেখল একটা বালিশ। পল্টুমামা নাই।

ঘরের দরজা খোলা।

পল্টুমামা বোধ হয় আগেই উঠেছেন। কলতলায় গেছেন হাতমুখ ধুতে। পল্টু ভাবল।

নাশতার সময়ও তাকে পাওয়া গেল না। মা রান্নাঘরে কাঠের চুলায় বাঁশের চোঙ দিয়ে ফুঁ দিচ্ছেন। ছাই উড়ছে। তাওয়ায় রুটি। তিনি রুটি সেঁকছেন। তার পাশে বসে আছে শোভা। সে মাকে সাহায্য করছে।

অরুণ আর শোভন পিঁড়িতে বসে রুটি খাচ্ছে আখের গুড় দিয়ে।

অরুণ বলল, 'আমাকে শৌচ করতে হবে না? আমি মাথা ন্যাড়া করব না?'

মা বললেন, 'বাবা রে। তোর বাবার জন্য প্রার্থনা কর। মার জন্য প্রার্থনা কর। সন্তানের প্রার্থনা ভগবান শুনবেন। কিন্তু বাবা-মার জন্য শৌচ করতে গিয়ে নিজের জীবনটা হারাস নে।'

অরুণ বলল, 'আমি বাবা-মার মুখাগ্নি করব না?' অরুণ কথা বলছে পাথরের মতো শক্ত হয়ে। তার মুখে কোনো বিকার নেই, তার কোনো ভাবান্তর নেই।

শোভনের মা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'এই অন্যায় অত্যাচার জুলুমের কোনো প্রতিকার নাই, আল্লাহ্। মাসুম বাচ্চার এই কষ্ট তুমি সহ্য করছ কী করে?'

AMARBOI.COM

অরুণ তবুও কাঁদছে না।

শোভনের মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা, তোমার বাবা-মা মারা গেছেন, তুমি একটু কাঁদো। কেঁদে বুকটা হাল্কা করো।'

অরুণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

শোভনের মা বললেন, 'তোমার মা তোমাকে কী বলে ডাকত?'

অরুণ বলল, 'সোনা মানিক।'

'তুমি মাকে কী বলে ডাকতে?'

'মা বলে।'

'তোমার মা কখনও তোমাকে মেরেছেন?'

'না। একবার মেরেছিল। আমি মারা যেতে ধরেছিলাম। সেই জন্য। কুয়ার মধ্যে নেমেছিলাম। আর উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু কাউকে বলি

নাই। দুই ঘণ্টা কুয়ার মধ্যে পাত ধরে আছি। তারপর মা জল তুলতে এলেন। আমি চিৎকার করে বললাম, মা আমি নিচে। উঠতে পারছি না। শুনে মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর লোকজন এলো। আমাকে তুলল। ওঠার পর মা আমাকে বললেন, কী করে পড়লি। আমি বললাম, পড়ি নাই। নিজেই নেমেছি। তখন মা আমার গালে একটা চড় মারলেন। পরে আমাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন। বললেন, আজ যদি তোর কিছু হতো তাহলে আমি বাঁচতাম কী করে?' বলতে বলতে অরুণ কাঁদতে লাগল। তার বাবা-মার মৃত্যুর পরে এই তার প্রথম কান্না।

শোভনের ঘরে টেবিলের ওপর একটা কাগজ গেলাস চাপা দিয়ে রাখা। পল্টুমামা চিঠি লিখেছেন:

বুবু,

আমি চললাম। বলে গেলাম না, কারণ বললে তোমরা যেতে দিতে না। দেশের এই দুঃসময়ে আমার মতো যুবক ঘরে বসে থেকে ভাতের চাল নষ্ট করবে, এটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে চললাম। কোন পথে কীভাবে যাব, নিরাপত্তার স্বার্থে তা বললাম না।

অরুণের বাবা-মা হত্যার প্রতিশোধ, এই রকম হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে।

দুলাভাইকে সালাম দিয়ো।

শোভন আর শোভার জন্য স্নেহাশিস।

অরুণের জন্য অনেক আশীর্বাদ।

তোমরা ভালো থেকো।

যদি ফিরি, দেশের স্বাধীনতা নিয়েই ফিরব। যদি না ফিরি, তাহলে দুঃখ কোরো না। কারণ দেশের স্বাধীনতা আমাদের চায়। তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারায় গৌরব ছাড়া আর কিছু নাই।

জয় বাংলা।

ইতি

পল্টু

AMARBOI.COM

বি. দ্র. বুবু, চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলো। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য, আমার নিরাপত্তার জন্য নয়।

শোভন চিঠিটা পড়ল। তার চোয়াল শক্ত হলো। সে চিঠিটা নিয়ে গেল মার কাছে, মার হাতে দিয়ে বলল, 'মা, আমিও যুদ্ধে যাব।'

মা তার দিকে একবার তাকিয়ে চিঠিটা পড়লেন। তারপর চিঠিটা তিনি রাখলেন ট্রাংকের ভেতরে।

AMARBOI.COM

প্রাইমারি স্কুলে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ক্যাম্প।

রাতের বেলা ক্যাম্প থেকে আসে মানুষের আর্তনাদ। মিলিটারিরা মানুষ ধরে নিয়ে যায় রোজ, আর নানা ধরনের অত্যাচার করে। আশপাশের লোকেরা সারা রাত ঘুমাতে পারে না। মাঝেমধ্যে গুলির শব্দ আসে। মাঝেমধ্যে আসে না।

শোনা যায়, স্কুলের ভেতরে যে পুরোনো ইঁদারাটা আছে, সেখানে মানুষকে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত ফেলে দেওয়া হয়।

ভয়ের গুমোট ভাবটা বজায় থাকে, কিন্তু স্থবিরতা কমে আসে। মানুষজন ফিসফিস করে কথা বলে, কিন্তু কথা তারা বলতে শুরু করে। মানুষজন পা টিপে টিপে চলে, কিন্তু চলাচল আবারও শুরু হয়।

শোভন, লিপটন, মাজেদ, অরুণ, সাত্তার আবারও জড়ো হয় তাদের পাটের গুদামে। তারা মুক্তিযোদ্ধা আর মিলিটারি মিলিটারি খেলে। বাম

হাতের বুড়ো আঙুলকে ট্রিগার বানায়, তর্জনীকে বন্দুকের নল, ডান হাত দিয়ে গুলি করে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে মুখে।

আরও আরও ছেলে জড়ো হয় এখানে।

খেলার সমস্যা হলো, কেউ পাকিস্তানি মিলিটারি হতে চায় না। সবাই খালি মুক্তিযোদ্ধা হতে চায়। এই জন্য খেলার শুরুতে দুই ভাগ করতে হয় ছেলেদের।

সেটা করার জন্য প্রথমে দুজন দলনেতা বানাতে হয়। তারপর জোড়ায় জোড়ায় আসতে হয়, একজনের হাতে থাকে পাতা, আরেকজনের ফুল, তারপর বলতে হয়, আতা পাতা বেলি, এসো ভাই খেলি। কে নেবে পাতা, কে নেবে ফুল।

দলনেতা কেউ হয়তো পাতা চায়, কেউ ফুল।

তারপর আবার টস করতে হয়। ওরা বলে হেড-টেল।

লটারি করতে হয়, কোন দল হবে পাকিস্তানি মিলিটারি, কোন দল হবে মুক্তিযোদ্ধা।

আবার একটা দল বলে, আমরা হলাম 'বিশ্ব'। মানে ওরা নিরপেক্ষ। ওরা যুদ্ধে কে জিতল হারল, সেটা বলবে। কখনো কখনো যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করবে।

এইভাবে খেলা জমে ওঠে।

অরুণও দিব্যি বাবা-মার কথা ভুলে খেলায় মেতে ওঠে।

AMARBOI.COM

পল্টুমামা বাসায় এসেছেন। তিনি এসেছেন তরকারিওয়ালা সেজে। একটা বড় ডালায় নানা রকমের তরকারি। তার নিচে তার স্টেনগান। তিনি একটা ময়লা লুঙ্গি পরেছেন। একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। আর তার ওপর একটা মলিন গামছা।

তিনি এসে বাসার গেটে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তরকারি লাগব নাকি আম্মা। তরকারি?'

শোভনের মা তখন কলতলায় বাসনকোসন মাজছিলেন। তিনি বললেন, 'না, না, লাগবে না।'

পল্টুমামা ধাক্কা দিয়ে কবাট খুলে আঙিনার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মা বললেন, 'এই তুমি কেমন মানুষ। মানুষের বাড়িতে বলা নাই কওয়া নাই ঢুকে যাও?'

পল্টু মামা বললেন, 'বইলা কইয়াই তো ঢুকলাম খালাম্মা।'

মা তাকিয়ে দেখলেন, 'এ যে তার ভাই পল্টু।'

তিনি বললেন, 'যা, ঘরে যা। আমি আসছি।'

বেলা ১১টার মতো বাজে। অরুণ আর শোভন তখন বাইরে চলে গেছে। শোভা উঠোনের এক কোণে খেলছিল। সেও চলে গেল ঘরে।

বাবা বাজার করতে গেছেন।

শোভনের মা এসে দরজা বন্ধ করলেন। জড়িয়ে ধরলেন ছোটভাইটাকে। 'তুই বেঁচে আছিস? একটা খবর দিলি না?' তিনি বিনবিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

তাই দেখে শোভা বলল, 'মা তুমি তো এত দিন এক ফোঁটাও কাঁদনি, আজ মামাকে দেখে কাঁদছ কেন? আজকে হাসো। মামা এসেছেন। আজ তো খুশির দিন।'

মা বললেন, 'তুই চুপ কর। তোকে অত পটরপটর করতে হবে না।'

পল্টুমামা বললেন, 'খবর দেবার তো কথা ছিল না। যদি খবর না থাকে জানবে ভালো আছি। যদি শহীদ হই, তাহলে খবর দেব।'

মা বললেন, 'এসব কী কথা? শহীদ কেন হবি? যুদ্ধে জিতে বীরের মতো ফিরবি।'

AMARBOI.COM

মামা বললেন, 'বুবু, যুদ্ধে তো যে কেউ যেকোনো সময়ে শহীদ হতে পারে। আমার পাশেই আমার বন্ধু শাহেদের গুলি লাগল....'

শোভনের মা কথা ঘোরানোর জন্য বললেন, 'তুই চশমা ছাড়া দেখতে পাস না। চশমা ছাড়া কীভাবে এলি?'

পল্টু বললেন, 'চশমা পরে আর যাই সাজা যাক, তরকারিওয়ালা সাজা যায় না। খুব অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু আন্দাজে চলে আসা যায়। ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে এইটাই প্র্যাকটিস করলাম। চশমা ছাড়া চলা। আমাদের পানিতে ডুবে থাকতে হয়, ক্রলিং করে চলতে হয়, চশমা একটা সমস্যা। তবে চশমা আছে।' বলে তিনি তরকারির ডালা থেকে চশমাটা বের করলেন।

শোভনের মা বললেন, 'তুই তরকারির ডালা নিয়ে ঘরে ঢুকলি কেন?'

'কেন ঢুকলাম, জানতে চাও?' পল্টু মামা তরকারির ভেতর থেকে স্টেনগানটা বের করলেন।

শোভা বলল, 'এইটা কী মামা? মেশিনগান নাকি স্টেনগান?'

মামা বললেন, 'এইটা স্টেনগান।'

শোভনের মা ছোটভাইকে পরতে দিলেন শোভনের বাবার জামা। লুঙ্গি। পরিষ্কার গামছা হাতে দিয়ে বললেন, 'যা গোসল করে আয়।'

বিকেলে খবর পেয়ে সূর্যসেনা সংঘের ছেলেরা সব চলে এল শোভনদের বাসায়।

লিপটন বলল, 'মামা, আপনি তো শুকিয়ে কাঠ লেগে গেছেন।'

পল্টুমামা বললেন, 'শুকনো লোকের অনেক সুবিধা। গুলি লাগবে না। মোটা হলে গুলি লাগার সম্ভাবনা বাড়বে।'

অরুণ বলল, 'ট্রেনিং নিলে নাকি হাঁটুতে আর কনুইয়ে ক্রলিংয়ের দাগ হয়। দেখি আপনার কী অবস্থা?'

পল্টু মামার হাঁটু আর কনুইয়ের অবস্থা সত্যি খারাপ। কালো হয়ে গেছে জায়গাগুলো।

সাত্তার বলল, 'মামা, একটা অপারেশনের গল্প করেন না?'

মামা বললেন, 'অপারেশনের গল্প শুনবি। একটা হাসির গল্প বলি শোন।'

'আমরা একটা পাকিস্তানি ক্যাম্পে হামলা করেছি।

গোলাগুলি করে ওদের চারজন সেন্ট্রিকে মেরে আমরা পালিয়ে আসছি। মধ্যখানে একটা খাল। সেই খাল পার হয়ে আমরা আসছি। খাল ভরা শুধু জোঁক আর জোঁক। আমরা এপারে এসে দেখি সবার গায়ে পায়ে অন্তত তিনটা করে জোঁক ধরে আছে। রক্ত খেয়ে সব ফুলে আছে। যাই হোক, পাকিস্তানি মিলিটারিরা আমাদের ফলো করে খালে নামল। ওরা তো পানিকে যমের মতো ভয় পায়। তার ওপর ধরল জোঁক। পায়ের জোঁক কিছুতেই ছাড়ে না। একটা মিলিটারি তখন জোঁককে গুলি করল। নিজের পায়ে নিজেই গুলি করে পানিতে পড়ে রইল। সবাই তখন ওকে বাঁচাবে না আমাদের ধাওয়া করবে। আমরা নিরাপদে আমাদের ক্যাম্পে চলে এলাম।'

সবাই সেই গল্প শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

AMARBOI.COM

মাজেদ বলল, 'মামা, গ্রেনেড এনেছেন?'

পল্টু মামা বলল, 'গ্রেনেড না। বল, আনারস।'

'আনারস?' বাচ্চাদের চোখেমুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। আমাদের কোড ল্যাংগুয়েজ। গ্রেনেডটকে আমরা বলি আনারস।'

'মামা, আমাদের গ্রেনেড চালানো শেখান।' ছেলেরা আব্দার করতে লাগল।

শোভন বলল, 'মামা তো একটা স্টেনগানও এনেছেন। আমরা স্টেনগানও চালানো শিখতে পারি।'

মামা বললেন, 'তোরা শিখতে চাস। কিন্তু এ তো হাতে-কলমে শেখানো যাবে না। কারণ, শব্দ করা যাবে না। কাজেই তোদের থিয়োরিটিক্যালি শিখিয়ে দিই।'

মামাকে নিয়ে ওরা চলে গেল বাড়ির পেছনের ঝোপে। সেখানে মামা দেখিয়ে দিলেন কীভাবে স্টেনগানে গুলি ভরতে হয়। কীভাবে ম্যাগাজিন চালাতে হয়।

আর গ্রেনেডের পিন দাঁতে খুলে কীভাবে এক থেকে দশ গোনার মধ্যে ছুড়ে মারতে হয়। তিনি বললেন, 'শোনো, এক থেকে দশ অনেক সময়। ভয় পেলে চলবে না। এর মধ্যে তিনবার তিনটা গ্রেনেড ছোড়া যাবে। একটা ছোড়া তো কোনো ব্যাপারই না।'

অনেক গল্পগুজব করে দুষ্টু ছেলের দল যার যার ঘরে ফিরে গেল সন্ধ্যা হওয়ার আগেই।

সন্ধ্যার সময় পল্টুমামা বললেন, 'বুবু, আমি একটু বাইরে যাব।'

শোভনের মা আঁতকে উঠলেন, 'কই যাবি?'

পল্টু বললেন, 'আমরা এসেছি একটা রেকি করতে। আমি আর মিজান। আমি এখন মিজানের বাড়ি যাব। সেখান থেকে একটু রেকি করতে বের হতে হবে।'

শোভনের মা বললেন, 'রাতের বেলা কেন?'

পল্টু বললেন, 'অন্ধকার রাতকে ওরা যমের মতো ভয় পায়। অন্ধকারে ওরা বের হবে না।'

AMARBOI.COM

মা বললেন, 'অস্ত্রগুলো কোথায় রাখবি?'

মামা বললেন, 'চালের বস্তায় লুকিয়ে রেখে যাই।'

বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যা যেন নেমে এসেছে। চারদিকে ভৌতিক পরিবেশ। এর মধ্যে পল্টুমামা বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

সারা রাত তিনি ফিরলেন না। শোভনের মা সারা রাত ঘুমুলেন না। একবার ওঠেন, একবার বসেন। একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন।

ভোরবেলার দিকে গেটে করাঘাত। শোভন, শোভন বলে কে যেন ফিসফিস করে ডাকছে।

মা জেগেই ছিলেন। তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন গেটের কাছে। কে?

'আমি মিজান। পল্টুর বন্ধু। দরজাটা একটু খোলেন। জরুরি।' মিজান হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

মা দরজা খুললেন। মিজান উঠোনে এলেন। বললেন, 'একটা ব্যাড নিউজ আছে। পল্টু ধরা পড়েছে।'

মা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কী বলো?'

মিজান চাপা গলায় বললেন, 'অস্ত্রগুলো দিন। সরিয়ে ফেলতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিটারি চলে আসবে।

আপনাদের বাড়ি সার্চ করবে।'

ততক্ষণে শোভন ও তার বাবা মনিরুজ্জামান সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বাবা বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'ধরা পড়ল কী করে?'

'সাইদুর রাজাকারের জন্য', মিজানমামা বললেন। 'আমার বাসার ওপর নজর রাখত সাইদুর রাজাকার। পল্টুকে আমার বাসায় ঢুকতে দেখেই ও আর্মিকে খবর দেয়।'

'তুমি পালালে কী করে?'

'আমার হাতে আর্মস ছিল। আমি গুলি করতে করতে বেরিয়ে গেছি। আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই বেঁচে আছি।'

শোভন থরথর করে কাঁপছে। শোভনের বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি পানির জগ থেকে মুখে ঢেলে পানি খাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

মা চালের বস্তা থেকে অস্ত্র আর গ্রেনেডগুলো বের করে দিলেন আরেক বস্তায়।

মিজানমামা দ্রুত বস্তা নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

মা বললেন, 'রেডি হও। ৫ মিনিট সময়। আমাদের বাড়ি ছাড়তে হবে।'

মা দ্রুত একটা ব্যাগে টাকাকড়ি নিয়ে শোভন, অরুণ আর শোভাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে গেটে তালা দিলেন। শোভনের বাবা পাঞ্জাবি পরতে পরতে বেরিয়েছেন আগে-ভাগে।

তাঁরা ছুটছেন। হাঁটুজল ভেঙে তাঁরা পাড়ি দিলেন বাইগুনি বিল। তাঁরা ছুটছেন আর ছুটছেন।

কোথায় যাবেন, তাঁদের জানা নেই। আপাতত বিলের ওপারের আমবাগানটা তাঁদের আশ্রয়।

AMARBOI.COM

তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তানি বাহিনীর একটা ট্রাক চলে এল কাছাকাছি। সেনারা নেমে দ্রুত ঘেরাও করে ফেলল তাদের বাড়ি। শোভনরা ততক্ষণে মিশে গেছে রাতের অন্ধকারের সঙ্গে।

আমবাগানেই ভোর হলো। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছেই। একটা পরিবার পড়ে আছে সেই বৃষ্টির মধ্যে।

শোভন, শোভা, তাদের মা, বাবা আর অরুণ ঘাসের ওপর বসে আছে। গাছের পাতায় পানি জমে বড় বড় ফোঁটা পড়ছে, মাঝেমধ্যে, তাদের মাথায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, লিপটনের পরিবার, মাজেদের পরিবার, সাত্তারের পরিবারও এসে পড়েছে এই আমবাগানে।

কারণ সবাই খবর পেয়ে গেছে। পল্টুমামা ধরা পড়েছেন। গতকাল বিকেলেই তাঁর কাছ থেকে তারা স্টেনগান চালনা আর গ্রেনেড ছোড়া শিখেছে। পল্টুমামাকে মার দেওয়া হলেই তিনি সবকিছু স্বীকার করে ফেলতে পারেন। তখন এদের প্রত্যেকের বাড়িতে মিলিটারি হামলা করতে পারে।

তাঁরা ঠিক করলেন, আরেকটু দূরে হাঁড়িভাঙা গ্রামে মনিরুজ্জামান সাহেবের স্কুলের পিয়ন আলিমুদ্দির বাড়ি, সেখানে গিয়ে তাঁরা আপাতত সবাই উঠবেন।

আরও মাইল খানেক হেঁটে সবাই পৌছাল হাঁড়িভাঙা নামের গ্রামটাতে।

আলিমুদ্দি পিয়ন হলেও শরিকদের কয়েকঘর মিলে তাদের বাড়িটা বড়ই। একেকটা পরিবারকে আলিমুদ্দি একেক ঘরে তুলল।

আর লেগে পড়ল মোরগ ধরতে। স্যার এসেছেন, তাঁদের ফ্যামিলি মেম্বাররা এসেছে। ভালো খাওয়া-দাওয়া না করালেই নয়।

সকাল দশটার দিকে সূর্যসেনা সংঘের ছেলেরা একটা কামরাঙা গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। গাছে কামরাঙা বোঝাই।

মাজেদ বলল, 'আমি বাঁদর, গাছে উঠে পড়ি। তোরা কামরাঙা খা।'

সে গাছে উঠে পড়ল। কামরাঙাগুলো পেকে হলুদ হয়ে আছে। কিন্তু একটা মুখে দিয়েই সে বলে উঠল, 'এই! খুবই টক। ছ্যা...'

মাজেদ গাছ থেকে মেনে এল।

পল্টুমামার পা বেঁধে স্কুল ভবনের টিনের চালের নিচের কড়িবর্গার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মাথা নিচের দিকে ঝুলে আছে। শরীরের ওজনে পায়ের কাছে দড়ির বাঁধনের জায়গাটা কেটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। ব্যথায় সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন। একটা বালতিতে পানি আনল একজন পাকিস্তানি সৈন্য। পল্টুমামার মাথা সেই বালতির পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। পল্টুর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এক্ষুনি বোধ হয় তিনি মারা যাবেন। এই সময় বালতি সরিয়ে নেওয়া হলো।

আরেকজন সৈনিক বুটপায়ে এক লাথি মারল তার ঘাড়ে। তিনি ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন।

'তোমার আর সঙ্গীরা কই? তোমরা কয়জন এসেছ সোনাতলায়?' প্রশ্ন করল একজন মিলিটারি অফিসার।

পল্টুমামার কানে কোনো কথা ঢুকছে না। ব্যথায় তার চেতনা লুপ্তপ্রায়। তাকে প্রহার করা হচ্ছে, লাথি মারা হচ্ছে, তিনি কোনো কিছুই টের পাচ্ছেন না।

AMARBOI.COM

অফিসার তার সৈনিকদের ডেকে বলল, 'একে মেরে ফেলো না। এর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে। একে কষ্ট দাও, কিন্তু এ যেন মরে না যায়। তবে সে যদি শেষ পর্যন্ত এইভাবে দাঁতে দাঁত চেপে থাকে, কোনো কথাই না বলে, তাহলে তাকে শেষ করেই ফেলতে হবে। দেখা যাক।'

সূর্যসেনা ক্লাবের সদস্যদের অনেকেই কামরাঙা গাছের নিচে।

লিপটন বলল, 'পল্টুমামাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মার দিচ্ছে। তারপর মেরে ফেলবে। উনি আমাদের ক্লাবের উপদেষ্টা। আমাদের কি চেষ্টা করা উচিত না তাকে মুক্ত করার?'

'আমরা কীভাবে সেটা করতে পারি? আমরা না ছোট?' অরুণ বলল।

লিপটন বলল, 'ছোট হলেও আমরা হলাম দুষ্টু ছেলের দল। লোকে আমাদের ডাকে বিচ্ছু বলে। আর চরমপত্রে মুক্তিযোদ্ধাদেরও বলা হয় বিচ্ছু। আমরা বুদ্ধি দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের চোখে ধুলা দিব। পল্টুমামাকে বের করে আনব।'

AMARBOI.COM

সাত্তার বলে, 'হায় হায়, এইটা কীভাবে সম্ভব?'

'সবাই বুদ্ধি খাটা। মাথায় ইনডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে টোকা দে। বুদ্ধি বের কর।'

তারা সবাই ভাবছে। ভাবতে ভাবতে লিপটন সায়েন্টিস্টই বুদ্ধিটা বের করে ফেলল।

বিকেলবেলা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। বাবা-মা কাউকে না বলে লিপটন, অরুণ, শোভন, মাজেদ, সাত্তার বেরিয়ে গেল হাঁড়িভাঙা গ্রাম থেকে। তারা যাচ্ছে সোনাতলা অভিমুখে।

চুপিচুপি তারা প্রথমে পৌছাল তাদের হাইস্কুলের পেছনের জংলাটায়। সেখানে গিয়ে তারা উঠে পড়ল জামালগোটা আর বিলাই চিমটি গাছে। জামালগোটা পাড়ল। বিলাই চিমটির ফল পাড়ল। পিয়ন চাচা শিখিয়ে দিয়েছেন, এই গাছের ফলের কী ভীষণ কার্যকারিতা।

তারপর তারা গেল ফেলানির মা বুড়ির কাছে। ফেলানির মা বুড়ি পাকিস্তানি ক্যাম্পে তরকারি কোটেন। থালাবাসন মাজেন। আর বিছানা পরিষ্কার করেন।

তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, 'ফেলানির মা, তোমার ফেলানি কই?'

'সেই কথা আর কইও না গো, ওরে মিলিটারিরা আটকায়া রাখছে,' বলে বুড়ি কাঁদতে লাগলেন।

লিপটন বলল, 'কেঁদো না। একটা কাজ করতে হবে। সেইটা করো। এই জামালগোটা কেটে ওদের বুটের ডালের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। আর ওদের বিছানায় এই বিলাই চিমটির পাউডার মেখে দেবে। এই কাজটা করো। আর কিছু করতে হবে না।'

বুড়ি জামালগোটা আর বিলাই চিমটির ফল নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

'আজ রাতের খাবারের সাথেই মেশাবে। আর আজকে রাতের বিছানাতেই এই বিলাই চিমটির পাউডার মাখবে।'

বুড়ি রাজি হলেন।

এবার তারা ছুটতে লাগল তাদের পাটগুদামের দিকে। ওখানে তারা বৈঠক করবে। ঠিক করবে তারপর কী করা যায়।

পাটগুদামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে এল।

ভেতরে ঢুকতেই তাদের মনে হলো, সর্বনাশ করেছে তারা। কে বা কারা এখানে আগে থেকেই অবস্থান করছে।

লিপটনের কাছে ছিল টর্চ। সেটা জ্বালতেই প্রথমে ভয়ে পরে আনন্দে তাদের আত্মহারা হওয়ার জোগাড়। মিজানমামা এখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

তারা বলল, 'মিজানমামা, আমরা আপনাকেই খুঁজছি।'

কাঁধের স্টেনগান ততক্ষণে মিজানের হাতে চলে এসেছে। শত্রু ভেবে তিনি যে গুলি করে বসেননি, এই তো বেশি।

লিপটন বলল, 'মিলিটারিদের আজকের রাতের খাবারে জামালগোটা মেশানো হচ্ছে। আর ওদের বিছানায় মেশানো হচ্ছে বিলাই চিমটির গুঁড়া।'

মিজান মামা বললেন, 'বলিস কী রে তোরা। কী করে?'
লিপটন বলল, 'বুদ্ধি দিয়ে। ইউ ক্যান রিলাই অন সায়েন্স।'

ফেলানির মা বুড়ি যত্ন করে জামালগোটা কাটলেন। বুটের ডালের সঙ্গে মেশালেন। খুবই সুন্দর করে মসলাপাতি দিয়ে তিনি রাঁধলেন বুটের ডাল।

রান্না হয়ে গেলে সব পাকিস্তানি সেনা যখন খেতে বসেছে, তখন বুড়ি ওদের ঘরে ঘরে ঢুকে বিছানার চাদর পরিষ্কার করার নাম করে বিছিয়ে দিতে লাগলেন এই ভয়াবহ ফলের গুঁড়ো। একটুখানি নিজের ত্বকেও লাগল। তিনি চুলকাতে চুলকাতে সেই জায়গা ছিলেই ফেললেন।

তারপর তিনি বিদায়-আদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যাম্প থেকে।

একটা ঘরে তার ফেলানি আটক। আরেকটা ঘরকে ওরা বানিয়েছে টর্চার সেল। সেখানে আটকে আছেন পল্টু মামা। আজ রাতেই পল্টুকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। খাওয়ার পরই সেটা করা হবে সেই ফায়ারিং স্কোয়াডের কাজ। অফিসার সেই অর্ডার দিচ্ছিলেন তার সৈন্যদের। ফেলানির মা সেটা শুনে ফেলেছেন। পল্টুর মুখ দিয়ে নাকি কোনো কথাই আদায় করা যাচ্ছে না।

রুটি খাওয়ার পরপরই সেনাদের সবার পেট একযোগে ব্যথা করে উঠল। সবাই একসঙ্গে ছুটতে লাগল বাথরুমের দিকে। কিন্তু এত বাথরুম তো নেই। সবাই লাইন করে বসে পড়ল মাঠে।

খাওয়ার পর যারা একটু আরাম করবে বলে বিছানায় গিয়েছিল, তারা গা চুলকাতে লাগল ভয়ঙ্করভাবে। চুলকানির অত্যাচারে তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বায়নোকুলারে সব দেখল মিজান আর তার পাশে পজিশন নেওয়া দুষ্টু ছেলের দল।

মিজানমামা বললেন, 'প্রথম ফায়ারটা আমি করব। তারপর তুই করবি মাজেদ।' ওদের মধ্যে মাজেদই একটু শক্তপোক্ত। সে স্টেনগান চালাবে। আরেকটা এলএমজি আছে মিজানমামার হাতে। তিনি সেটা চালাবেন।

AMARBOI.COM

ওরা গুলির রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে গেল ক্রলিং করে। সামনে পাকিস্তানি সেনারা লাইন করে মলত্যাগ করছে আর গা চুলকাচ্ছে।

মিজানমামা ফায়ার ওপেন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাজেদও গুলি চালাতে লাগল। মাজেদের জীবনের প্রথম ফায়ার। গুলি যে কই গেল, কে জানে, তবে সব পাকিস্তানি সেনা ঢলে পড়ল। সেটা মিজানমামার গুলিতে নাকি মাজেদের গুলিতে এই নিয়ে পরে তারা অনেক কথা বলাবলি করবে।

তারা দ্রুত সামনে এগোতে লাগল। পাকিস্তানি সেন্ট্রিরা সবাই পেটের জ্বালায় আর চুলকানির যন্ত্রণায় পোস্ট ছেড়ে দিয়েছিল। তারা ছুটে বাইরে আসতেই পড়ল মিজান আর মাজেদের ব্রাশফায়ারের মুখে।

পিচ্চি দল এগোচ্ছে। সামনে মিজান।

প্রত্যেকটা পিচ্চির হাতে একটা করে গ্রেনেড।

এই স্কুলের অলিগলি অন্ধিসন্ধি তাদের মুখস্থ। কারণ এই স্কুলেই তারা কিছুদিন আগেও পড়েছে। সেনাদের বেরোনোর রাস্তা একটাই। সেটার মুখে তারা অস্ত্র বাগিয়ে রইল। অস্ত্র হাতে বেরোতে গিয়ে ওইখানে মারা পড়ল প্রতিটা সেনা।

আর কোনো আওয়াজ নেই।

তারা ঢুকে গেল স্কুলঘরে।

পল্টুমামাকে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা জানালার রডের সঙ্গে। মিজানমামা তাড়াতাড়ি সেই বাঁধন খুলে ফেললেন।

শোভন বলল, 'মামা, কুইক। আমাদের বেরোতে হবে।'

পাশের ঘরে আটকে আছে ফেলানি।

সেই ঘরে ঢুকে তাকে উদ্ধার করল মিজান আর পিচ্চিরা।

তারপর তারা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মিজান বললেন, 'অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। নে, যে যতটা পারিস, অস্ত্র নিয়ে নে।'

ফেলানি বলল, 'আমিও নিতাছি। চলেন।' সে গেল মিলিটারির কমান্ডারের কাছে। ওই ওখানে কমান্ডার পড়ে আছে চিত হয়ে।

ফেলানি তার গায়ে একটা লাথি মারল প্রথমে। তারপর তার পাশে পড়ে থাকা একটা অস্ত্র তুলে নিতে উবু হলো।

AMARBOI.COM

এই সময় ওই কমান্ডারের হাত উত্তোলিত হলো অস্ত্রসমেত। একটা রিভলবার বাগিয়ে সে গুলি ছুড়ল ফেলানির মাথা-বরাবর।

ফেলানি মরে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মিজান মামা সেটা লক্ষ করেছিলেন। তিনি ফায়ার ওপেন করলেন।

কমান্ডারের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল মুহূর্তেই।

সোনাতলা আজ মিলিটারিশূন্য।

তারা সবাই গান ধরল, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...

ফেলানির মায়ের কাছে তার মেয়েকে পৌঁছে দিতে হবে। মিজান, মাজেদ, অরুণ, পল্টু মামা সবাই ধরল ফেলানির দেহটা। অতি কষ্টে তারা দেহটা বয়ে আনতে পারল ফেলানির মায়ের ছাপরাঘরের সামনে। ফেলানির রক্তে তাদের শরীরের কাপড় লাল হয়ে গেল।

ফেলানির মা বললেন, 'বাবাসকল, তোমরা আইছ। তোমাগো কাম আমি কইরা দিছি। আমার কামডা কি বাবা তোমরা করতে পারলা? আমার ফেলানি রে আনতে পারলা?'

মিজানমামা বললেন, 'আপনার মেয়েকে এনেছি মা। এই যে আপনার মেয়ে...'

অরুণ, শোভন, মিজান, সাত্তার, লিপটন সবাই কাঁদছে।

ফেলানির মা বললেন, 'তোমরা কান্দো কেন বাপজান। তোমরা কান্দো কেন। এই তো ফেলানি আইছে। আমার মনে কোনো দুঃখ নাই...'

ওরা ছুটছে। বিল পেরিয়ে যাচ্ছে হাঁড়িভাঙা গ্রামে। সেখান থেকে আবার তাদের পালিয়ে যেতে হবে কোনো একটা অচেনা দূরবর্তী গ্রামে। যেই গ্রামে কোনো রাজাকার নেই।

সাইদুর রাজাকারের মতো মানুষ থাকলে পল্টুমামার মতো আবারও ধরা পড়তে হতে পারে। যে কেউ ধরা পড়তে পারে। মিজানমামা পারেন।

AMARBOI.COM

পল্টুমামা পারেন। এমনকি শোভন, মাজেদ, সাত্তার, অরুণ কিংবা লিপটনকেও ওরা ধরিয়ে দিতে পারে মিলিটারির হাতে। রাজাকারদের কোনোই বিশ্বাস নেই।

হাঁড়িভাঙা গ্রামে আলিমুদ্দি চাচার বাড়িতে পৌছুতে রাত গভীর হয়ে এল। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আলিমুদ্দি চাচার বাড়িতে গরম গরম ভাত রাঁধা হয়েছে। সবাই গোল হয়ে বসে গরম ভাত খাচ্ছে।

ভাত খাওয়া হয়ে গেলে মিজানমামা বললেন, 'আমাদের যেতে হবে।'

শোভনের মা বললেন, 'পল্টু তো হাঁটতেই পারে না। ও কীভাবে যাবে।'

পল্টুমামা বললেন, 'যেতে তো হবেই বুবু। বাংলাদেশ স্বাধীন করে আবার আমরা ফিরব। আর তোমাদের কোনো ভয় নাই। সূর্যসেনা সংঘের ছেলেরা তো তোমার সাথে থাকলই।'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ আমরা আছি। আমার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে, তাতে কী? আমরাও প্রতিশোধ নিয়েছি। এবার সাইদুর রাজাকারকে ধরতে হবে। যাতে তারা আর কোনোদিনও কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিটারির হাতে তুলে দিতে না পারে।'

পরের দিন শোনা গেল, পাকিস্তানি সৈন্যরা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসছে সোনাতলায়। পুরো সোনাতলা তারা জ্বালিয়ে দেবে। এইখানে তাদের যত ক্ষতি হয়েছে, এই রকম ক্ষতি আর কোথাও হয়নি। একজন অফিসারসমেত ২২ জন সৈনিক মারা গেছে। বহু অস্ত্রপাতি লুট হয়ে গেছে। পাকিস্তানের বীর মিলিটারি এই দুষ্কৃতি কিছুতেই সহ্য করবে না। স্বয়ং টিক্কাখান হুকুম দিয়েছেন, সোনাতলা জ্বালিয়ে দাও। সাইদুর রাজাকার নিজ মুখে পাড়াপ্রতিবেশীকে এই খবর দিল। আগামী বুধবারই মিলিটারি এই বন্দরে এসে যাবে। কোনোই দুশ্চিন্তা নাই। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

AMARBOI.COM

কিন্তু মঙ্গলবারেই ঘটল সেই ঘটনা। ভারত স্বীকৃতি দিয়ে দিল বাংলাদেশকে। পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করল ভারতের সঙ্গে। সৈন্যদের হুকুম দেওয়া হলো, বর্ডারে যাও, ইন্ডিয়ান সোলজার ঢুকে পড়তে পারে পাকিস্তানের মাটিতে, বর্ডার পাহারা দাও।

সোনাতলায় আর নতুন করে মিলিটারি ঢুকতে পারল না। তাদের আর লোকালয়ে লোকালয়ে ডিউটি করার মতো অবস্থা নাই। এবার একেবারে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

সোনাতলার আকাশেও যুদ্ধজাহাজ উড়তে লাগল। পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান আর ভারতীয় যুদ্ধবিমান আকাশে মোরগলড়াইয়ের মতো করে একে অন্যকে ধাওয়া করছে।

আলিমুদ্দি চাচার বাড়ির উঠোনে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। ওরা বলে ট্রেঞ্চ। শোভনদের ট্রেঞ্চটা ভি শেইপ। ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো।

প্লেনের শব্দ পাওয়া মাত্র সবাই সেই ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ে।

পল্টুমামা, মিজানমামা সবার সামনে। ভারতীয় মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর মিলিত দলটা এগোচ্ছে সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের ভেতরের দিকে। একটার পর একটা জনপদ শত্রুমুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

জয় বাংলা শব্দে মুখরিত হয়ে উঠছে সেই স্বাধীন জনপদগুলো।

শোভনরা জীবনের প্রথম ট্যাংক দেখল। ভারতীয় সৈন্যরা সেই ট্যাংকে বসে আছে। ট্রাকে করে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের দল, তাদের পাশাপাশি। ট্যাংকগুলো বাইগুনি বিল পার হয়ে গেল অবলীলায়।

সোনাতলাও স্বাধীন হয়ে গেল।

পল্টুমামা, মিজানমামা ট্রাকের সামনে। তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে শোভনরা। ট্রাকটা একটুক্ষণের জন্য থামল বেলতলায়। শোভনদের দল ছুটে গেল সেখানে।

পল্টুমামা ট্রাক থেকে নেমে বললেন, আমরা ঢাকার দিকে যাচ্ছি।

ঢাকা জয় করলেই যুদ্ধ শেষ। আর কয়েকটা দিন মাত্র। তারপর বাংলাদেশ একেবারেই শত্রুমুক্ত হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

ট্যাংকগুলোর চাকা বিশাল শেকল দিয়ে ঘেরা। পুরো শেকলটাই চাকার মতো ঘোরে। তার ওপরে বসে আছে ভারতীয় সৈন্যরা। গ্রামের বউঝিরা পর্যন্ত বড় বড় ঘোমটা টেনে ট্যাংক আর মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর লোকদের এগিয়ে যাওয়া দেখছে। ভারতীয় সৈন্যরা বলছে, আশিস করো মা।

শোভনের মা বললেন, আমি অবশ্যই আশীর্বাদ করি। এই মিত্রবাহিনীর সবাই যেন নিরাপদ থাকে। এরা যেন জয়ী হয়। আমি রোজা থাকব। নফল রোজা। আর যেন আমার পল্টু ভালো থাকে। মিজান ভালো থাকে।

আলিমুদ্দি চাচার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে তারা সোনাতলায় নিজের বাড়িতে ফিরে এলো।

১৬ই ডিসেম্বরে বিকালে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। সেই খবর পৌঁছে গেল সোনাতলা বন্দরেও।

শোভন, লিপটন, মাজেদ, অরুণ, সাত্তার সবাই সেই সন্ধ্যাতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। শোভন বুদ্ধি করে মার ট্রাংক থেকে বের করে নিল তাদের সেই জয় বাংলার পতাকাটা।

জয় বাংলা জয় বাংলা স্লোগানে তারা মুখর করে তুলল সোনাতলার আকাশবাতাস।

মিজানমামা ফিরে এসেছেন। কিন্তু পল্টুমামা ফেরেননি।

মিত্রবাহিনীর বহরটার একেবারে সামনের ট্রাকে ছিলেন তারা। হাসনাবাদের কাছে তারা একটা পাকিস্তানি বহরের মুখোমুখি হন। ওপাশ থেকে ছোড়া মর্টারের গোলা ট্রাকের সামনে এসে পড়ে।

একটা স্প্রিন্টার এসে কোত্থেকে লাগে পল্টুমামার মাথায়। তিনি ওখানেই শহীদ হন।

মিজানমামা শোভনদের বাসায় এসে সেই খবর দিলেন। হাসনাবাদের কাছেই রাস্তার ধারে পল্টুমামাকে সমাহিত করা হয়েছে।

রোদ উঠেছে। জানুয়ারি মাস। সোনাতলা হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে যোগ দিয়েছে সূর্যসেনা সংঘের ছেলেরা। তাদের অটোপ্রমোশন হয়েছে।

AMARBOI.COM

ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়েই তারা সিক্স থেকে সেভেনে উঠে গেছে। দুপুরবেলা। শোভন স্কুলে। শোভা স্কুলে। ওদের বাবা স্কুলে।

শোভনের মা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রান্নাঘরের চালে একদল কবুতর বাকুমবাকুম ডাকছে।

নিমগাছের দিকে তাকান তিনি। নিমপাতাগুলো ছোট ছোট, কিন্তু কী সুন্দর করে সাজানো।

এত সুন্দর আজকের দিনটা।

এমন সুন্দর দিনে তার বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে কেন।

তিনি ঘরে ঢুকলেন। ট্রাংক খুললেন। পল্টুর শার্ট, পাজামা। তিনি সেসব বের করে গন্ধ শুকতে লাগলেন। ন্যাপথলিনের গন্ধ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। ট্রাংকের একেবারে তলায় হাত দিলেন তিনি।

পল্টুর চিঠিটা ওখানেই আছে।

তিনি সেটা বের করলেন।

বুবু,

আমি চললাম। বলে গেলাম না, কারণ বললে তোমরা যেতে দিতে না। দেশের এই দুঃসময়ে আমার মতো যুবক ঘরে বসে থেকে ভাতের চাল নষ্ট করবে, এটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে চললাম। কোন পথে কীভাবে যাব, নিরাপত্তার স্বার্থে তা বললাম না।

অরুণের বাবা-মা হত্যার প্রতিশোধ, এই রকম হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে।

দুলাভাইকে সালাম দিয়ো।

শোভন আর শোভার জন্য স্নেহাশিস।

অরুণের জন্য অনেক আশীর্বাদ।

তোমরা ভালো থেকো।

AMARBOI.COM

যদি ফিরি, দেশের স্বাধীনতা নিয়েই ফিরব। যদি না ফিরি, তাহলে দুঃখ কোরো না। কারণ দেশের স্বাধীনতা আমাদের চায়। তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারায় গৌরব ছাড়া আর কিছু নাই।

জয় বাংলা।

ইতি

পল্টু

শোভনের মার দুচোখ জলে ভরে উঠল। তিনি পাগলের মতো পল্টুর জামাকাপড় বুকে জড়িয়ে কান্নাভরা স্বরে বলতে লাগলেন, ‘পল্টুরে, আমার ছোট ভাইটারে, তুই ফিরে আয়। তুই ফিরে আয়।’

ততক্ষণে শোভন আর শোভা স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে। মাকে কাঁদতে দেখে তারাও কেঁদে ওঠে, ‘পল্টুমামা, তুমি ফিরে এসো। পল্টুমামা গো।’

রান্নাঘরের টিনের চালে বসে থাকা কবুতরগুলো রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে মুক্ত বাতাসে পাখা মেলে দেয়। এই আকাশ আজ মুক্ত। এই আকাশে উড়তে তাদের কোনোই ভয় নেই।

AMARBOI.COM

সাত্তার আবার সাইনবোর্ড লিখেছে। আগের সাইনবোর্ডটা তো বাইগুনি বিলের পানিতেই তাদেরকে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে। এবার তাকে লিখতে হচ্ছে: শহীদ কবির হোসেন স্মৃতি সূর্যসেনা সংঘ।

কবির হোসেন পল্টুমামার ভালো নাম।

সেই সাইনবোর্ড তারা জোড়া আমগাছের একটায় টাঙিয়ে দিল। সাইনবোর্ডটা টাঙানোর জন্য বাঁদর মাজেদ তরতর করে উঠে পড়ল গাছে। সাইনবোর্ড টাঙানো হলে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল একযোগে। দেশ স্বাধীন। এখন আর কেউ তাদের বলবে না, সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলো।

সবার চোখেমুখে আনন্দ, সবার মুখে হাসি।

হঠাৎ অরুণ কেঁদে উঠল— বাবা বাবা, মা মা।

দুষ্টু ছেলের দল একসাথে তাকে জড়িয়ে ধরল। তাদের সবার চোখেই জল। তারা জানে না, বাবা-মা দুজনকে একসঙ্গে হারালে কোনো কিশোর সন্তানের কেমন লাগে। কিন্তু তারা সবাই মিলে বুকে বুক লাগিয়ে অরুণের বুকের দুঃখটা ভাগ করে নিতে চাইছে। তারা বলতে লাগল, অরুণ অরুণ, কাঁদিস না ভাই। এই যে আমরা আছি না?

স্কুলের ফ্লাগস্টান্ডে তখন বাংলাদেশের পতাকাটা পতপত করে উড়ছে। সবুজ, লাল, আর হলুদ পতাকা।

AMARBOI.COM